কিশোর রচনা সংকলন



মেঘনাদ সাহা

কিশোর রচনা সংকলন



মেঘনাদ সাহা

সঙ্কলন ও সম্পাদনা
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়   এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯

প্রকাশক ঃ
রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুআরি ১৯৮৫

প্রচ্ছদ ঃ সঞ্জয় দত্ত

মূল্য দাম ১৫

মুদ্রাকর ঃ
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা—৬

জল ছাপিয়ে সমস্ত মাঠঘাট ঢেকে বাড়ির উঠোন অবধি চলে আসত। প্রত্যেক বাড়িরই থাকত নিজস্ব নৌকো। বর্ষাকালে নৌকো ছাড়া চলাফেরার জন্য উপায় ছিল না। তা ছাড়া জলের দেশে সাঁতার জানা ছিল অতিশয় জরুরী। বলা হয় যে ওদেশে শিশুরা হাঁটার আগেই সাঁতার শেখে। মেঘনাদও অল্প বয়সেই হয়ে ওঠেন দক্ষ সাঁতারু। গরমকালে অবশ্য পাগলা বংশাই নদী হয়ে উঠত খালের মত সরু। ছাতা মাথায় লম্বা লম্বা পা ফেলে মেঘনাদকে তখন দোকানে বাবার জন্যে খাবার নিয়ে যেতে হত। ফলে তিনি হন্টনেও পটু ছিলেন। এই হাঁটার অভ্যাস তাঁর চিরকালই ছিল।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়তে গেলেন মেঘনাদ। তাঁর বাবার মনে বাসনা যাই থাক ঘটনা ঘটল অন্যরকম। স্কুলের দুই শিক্ষক শশিভূষণ চক্রবর্তী এবং যতীন চক্রবর্তী মশাই দেখলেন ছেলেটির মেধা অসাধারণ। দ্রুত শিখে ফেলার সহজাত ক্ষমতা নিয়েই যেন সে জন্মেছে এবং যা শেখে তা সহজে ভোলে না। পড়াশোনার প্রতি এরকম অনুরাগও তাঁরা কোন ছেলের মধ্যে দেখেন নি। একলব্যের মত একাগ্র দৃষ্টি তাঁর। বই ছাড়া অন্য কোথাও তাকান না। এমনকি যখন মাঝে মাঝে দোকানে গিয়ে বসতে বাধ্য হতেন তখনও সংগে থাকত একতাড়া বই।

খুব ভোরে উঠে পড়তে বসে যেতেন মেঘনাদ। মাকে বলা ছিল ঘুম থেকে তুলে দেন যেন। যদি কোনদিন ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে গেল তা হলে রাগে দুঃখে কান্না জুড়ে দিতেন। যদি বই কি স্লেট বা পেন্সিল কেনার দরকার হত কিন্তু সময়মত সেগুলো পেতেন না তাহলে তিনি হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে বসতেন। বাড়ির লোকে কান্নার মানে বুঝতেন না। তাঁরা বলতেন কাঁদুনে ছেলে। ওখানকার ভাষায় কান্দুনা। পড়াশোনায় এত মন সত্যি বলতে কি জগন্নাথ মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। ভোরবেলা জোরে জোরে মুখস্থ করার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেলে রেগে আগুন হয়ে তিনি ছেলেকে মারধর পর্যন্ত করতেন।

কিন্তু মেঘনাদ নাছোড়বান্দা। যে যাই বলুক তিনি তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যাবেনই। বাবার প্রহার তাঁকে মোটেই বিচলিত করত না। এমন নয় যে তিনি বাড়ির কাজে অবহেলা করতেন। যখন যা করতে বলা হত করতেন। দুপুর বেলা দোকানে খাবার পৌঁছে দিতেন। কিন্তু মন পড়ে থাকত বইয়ের দিকে।

এইভাবে প্রাইমারী স্কুলের পালা শেষ হলো। এখন কি হবে? বাবার ইচ্ছে এবার তিনি পুরোপুরিভাবে দোকানের কাজে লেগে যান, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকরা চান মেঘনাদ মিডল স্কুলে পড়ুক। তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেওয়া হোক। এই টানাপোড়েনের মধ্যে মেঘনাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন তাঁর বড়দা জয়নাথ। তিনি বললেন মেঘনাদকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

তা না হয় হলো, কিন্তু গ্রামে কোন মিড্‌ল স্কুল নেই। সাত মাইল দূরে শিমুলিয়া গ্রামে আছে মিড্‌ল স্কুল। রোজ সাত মাইল হেঁটে যাওয়া-আসা এমনকি মেঘনাদের পক্ষেও তো সম্ভব নয়। কথায় বলে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। জয়নাথ উপায় বার করলেন। শিমুলিয়াতে থাকতেন ডাক্তার অনন্ত কুমার দাস। তিনি বললেন মেঘনাদ আমার বাড়িতে থাকুক। তার থাকা খাওয়ার জন্যে কোন পয়সাকড়ি দিতে হবে না, তবে দরকার মত বাড়ির কাজ কর্ম করে দিতে হবে। মেঘনাদ তো মহা আনন্দে রাজী। তাঁকে নিজের বাসন নিজের হাতে ধুতে হত। কারণ যত ভাল লোকই হোন না ডাক্তারবাবু ও তার স্ত্রী, জাতপাত নিয়ে খুঁতখুঁতেমি ছিল। অবশ্য তখনকার দিনে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। এই সামান্য কাজে মেঘনাদের কোন আপত্তিও ছিল না। অনেক সময় পুকুর পাড়ে এঁটো বাসন নিয়ে মাজতে বসেছেন কনকনে শীতের রাতে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু তাঁর সামনে অনেক কিছু জানতে হবে। এ সব তুচ্ছ বাধা তাঁর কাছে বাধাই নয়। দাস পরিবারের গোয়ালঘরেও কিছু কাজ করতে হত তাঁকে। সারাজীবন কিন্তু মেঘনাদ সাহা এঁদের উপকারের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। পরবর্তীকালে এঁদের অর্থসাহায্যও করেছেন নিয়মিত। এঁরা না থাকলে তাঁর জীবন শ্যাওড়াতলীতেই ফুরিয়ে যেত।

দাদার মুখ রাখলেন মেঘনাদ। মিড্‌ল পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেলেন। তখন বয়স বারো। তিনি হাই স্কুলে পড়ার জন্যে এলেন ঢাকা শহরে। গ্রামের ছেলে এলেন ঢাকা শহরে। দেখলেন অন্যরকম আবহাওয়া, সেখানে কত লেখাপড়া জানা জ্ঞানী-গুণীর বাস। গ্রামের জীবন থেকে কত আলাদা, কত বিচিত্র এই জগৎ! তবুও গ্রামের শিক্ষকরা তাঁকে অনেক দিয়েছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর অংকের মাস্টারমশাই প্রসন্নকুমার চক্রবর্তীর কথা। যে অংক তাঁর জীবনভোর সাধনার বিষয়ের তার প্রতি ভালবাসার বীজ রোপণ করেন প্রসন্ন চক্রবর্তী। মেঘনাদ সাহার ছোটবেলার কথা স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাতে হয় এইসব নীরব কর্মীদের, যাঁরা চিরকাল লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ করে গেছেন।

মিড্‌ল স্কুল থেকে পাশ করার পর মাসিক চার টাকা বৃত্তি পান মেঘনাদ। জয়নাথ দিতেন মাসে আরো পাঁচ টাকা। এছাড়া পূর্ববঙ্গ বৈশ্য সমিতি উপযাচক হয়ে এগিয়ে দিলেন মাসে মাসে আরো দু-টাকা। এইভাবে মাসে এগারো টাকা সম্বল করে মেঘনাদ এসে পৌঁছলেন ঢাকা।

তখনকার দিনে অবশ্য স্কুলের মাইনে দিয়েও ঐ টাকায় থাকা ও খাওয়া চলে যেত। তখনকার একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়—স্কুলের মাইনে তিন টাকা, থাকা খাওয়া ১০ টাকা, জলখাবার ১ টাকা, অন্যান্য ১ টাকা। অর্থাৎ পনের টাকায় বেশ ভালই চলে যাবার কথা। সাহা অবশ্য বিলাসিতার ধার ধারতেন না, ছোটবেলা থেকেই তিনি হিসেব করে চলতে শিখেছিলেন।

ঢাকায় প্রথমে আর্মানীটোলায় ও পরে নলগোলায় একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো তাঁর। গরমের ও পূজোর ছুটিতে বাড়ি যেতেন। তখন গরুদের স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া, বাজার-হাট করা, ছোট ভাইবোনদের পড়ার সাহায্য ইত্যাদি করতে হত। তারই ফাঁকে চলত বন্ধুদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ ও নৌকা বাওয়া।

মেঘনাদ যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র তখন, বঙ্গ-ভঙ্গের তুমুল আলোড়ন শুরু হলো। সময়টা ১৯০৫ সাল। বাংলার ইতিহাসের খুবই বিক্ষুব্ধ সময় সেটা। বিদেশী কাপড় পোড়ানো, বিদেশী জিনিস বয়কট ইত্যাদির মধ্যে সাহাও জড়িয়ে পড়লেন। ঐ সময় তাঁদের স্কুলে গভর্নর স্যার বাম্পফিল্ড ফুলার এসেছিলেন। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে ছেলেরা খালি পায়ে স্কুলে এসেছিল, বিক্ষোভ হয়েছিল! মেঘনাদ খালি পায়ে এসেছিলেন বলে অন্য অনেকের সঙ্গে তাঁকেও স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

বেচারা মেঘনাদ পড়লেন মহা বিপদে। স্কুল থেকে নাম কাটা ত গেলই, বৃত্তিটাও গেল। যাই হোক ভাল ছাত্র বলে ততদিনে তাঁর নাম হয়েছে। ঢাকার প্রাইভেট স্কুল কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল তাঁকে সাগ্রহে নিল, এমনকি অর্থ সাহায্য নিয়েও এগিয়ে এল। এখান থেকেই এণ্ট্রান্স পাশ করেন তিনি। অংক, ইংরিজি এবং বাংলায় সর্বোচ্চ মার্কস পেয়ে পূর্ববঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র হয়ে ওঠেন। সবচেয়ে ভালবাসতেন টডের রাজস্থান। অংকের পরেই তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস।

কলেজ থেকে শুরু হলো তাঁর জয়যাত্রার ইতিহাস। সে কাহিনী সবারই জানা। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সাহার আড়ালে সেই চিরকাল গ্রামের বালকটি সব সময়েই বেঁচেছিল।

তাঁর বড় ছেলে অজিতের বয়স যখন তেরো সেই সময় তাঁকে ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ড হয়ে আমেরিকা যেতে হয়। সেবার তিনি অজিতকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এই যাত্রাটি খুবই রোমাঞ্চকর ছিল। বম্বে থেকে বাসরা জাহাজে, বাসরা থেকে বাগদাদ হ'য়ে মরুভূমির ওপর দিয়ে গাড়ীতে বেইরুট ও পরে হাইফা। হাইফা থেকে জাহাজে ত্রিয়েস্তে—তারপর আবার ট্রেন। মিশর, গ্রীস ও অন্যান্য দেশ বেড়িয়ে অজিতকে সুইজ্যারল্যাণ্ডের একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় কাজ সেরে ফেরার সময় অজিতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন।

১৯৮৪-র প্রথম দিকে অধ্যাপক অজিত কুমার সাহা একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা গিয়েছিলেন। এই সুযোগে পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে শ্যাওড়াতলী যান। গ্রাম তেমনই আছে, অবস্থা অবশ্য এখন অনেক ভালো। শ্যাওড়াতলী ও আশেপাশের গ্রামের অধিবাসীরা বিপুল সম্বর্ধনা দেন অধ্যাপক অজিত সাহাকে। দলে দলে ছোটছেলেরা তাকে দেখতে আসে।

আর অজিত সাহা দেখছিলেন অতি সাধারণ, সামান্য বাস, খালি গা একপাল ছেলেকে আর ভাবছিলেন এই ছেলেদের একজন অসীম মনোবল ও কঠিন সাধনায় কি করে বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কত সাহস ও ইচ্ছাশক্তি লাগে ?..

জনপ্রিয় স্তরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু লেখা লিখেছেন সাহা, বক্তৃতাও দিয়েছেন বাংলা ও ইংরেজীতে। তবে ছোটদের পত্র-পত্রিকাতে আলাদা করে তিনি তেমন লেখেন নি। একমাত্র ব্যতিক্রম শিশু ভারতীতে প্রকাশিত কিছু রচনা—যার সবগুলিই এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাহা যে সময়ে এলাহাবাদে বাস করছিলেন তখন কয়েক বছর যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তও সেখানে ছিলেন। শিশুভারতী এলাহাবাদ থেকেই ছাপা হয়। তাঁরই অনুরোধে সাহা বিশেষ করে শিশুভারতীর জন্যেই এই প্রবন্ধগুলি লেখেন ছোট পাঠকদের কথা মনে রেখে। এখানে তাঁর লেখার ধরন অন্যরকম। তাঁর অন্য বাংলা ধারণার সঙ্গে এগুলির মূল প্রভেদ সেখানেই। পরে তিনি কলকাতায় চলে আসার পর নানা কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে আলাদা করে ছোটদের জন্য কিছু লেখা হয়ে ওঠেনি। হয়ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত সেরকম কোন সম্পাদক তাঁকে অনুরোধ অথবা জোর করতে ভরসা করেন নি। অনেকটা দূরত্ব রচিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমেই জাতীয় পরিকল্পনা, নদী পরিকল্পনা ইত্যাদি সর্বভারতীয় ব্যাপারে প্রবেশ করে তিনি অনেক দূরের মানুষ হয়ে যাচ্ছিলেন।

মেঘনাদ সাহার কিশোর রচনার সঙ্গে তাই যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম বিশেষভাবে জড়িত। যোগেন্দ্রনাথের তাগাদা ছাড়া এগুলি লেখা হত না। প্রসঙ্গত এই লেখার ছবিগুলি সাহারই ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন সাহার আঁকা। তিনি তখন সাহার বাড়ী থাকতেন ও ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করতেন। এই সঙ্কলনে সব ছবিগুলি দেওয়াযায় নি। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে।

কলকাতায় ফেরার পর মাত্র একবারই তিনি শিশু সাহিত্যের কাছাকাছি আসেন—মৃত্যুর কয়েক বছর আগে শিশু সাহিত্য সংসদের একটি বার্ষিক সভায়। তাঁর বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে ছিল কলকাতায় একটি তারামণ্ডল তৈরি করার প্রস্তাব। তখনও বিড়লা তারামণ্ডল তৈরি হয়নি। সাহা তাঁর এই বক্তৃতায় একটি অভিনব পরিকল্পনা দেন। তিনি দেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের গম্বুজটিকে একটি তারামণ্ডলে পরিণত করার নিখুঁত একটি পরিকল্পনা। দুঃখের বিষয় লেখাটির কোন লিখিত কপি পাওয়া যায় না। কাজেই শিশুভারতীতে প্রকাশিত এই লেখাগুলিই তাঁর একমাত্র কিশোর-পাঠ্য সহজ বিজ্ঞানের লেখা হিসেবে থেকে গেল।

১৬৪/৭৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫ — শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
৬ই জুলাই, ১৯৮৪ — এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র



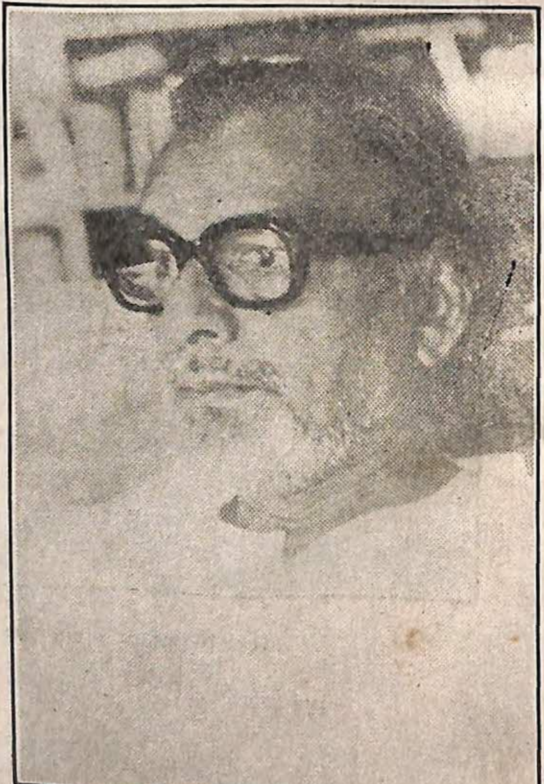
বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার একটি বিরল আলোকচিত্র



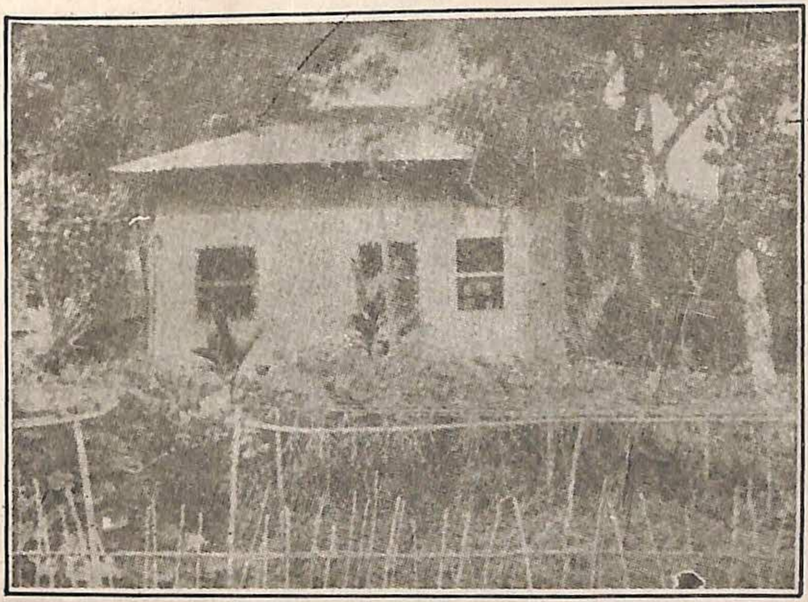
বাবা : জগন্নাথ সাহা



মা : ভুবনেশ্বরী



ডঃ মেঘনাদ সাহার
জেষ্ঠ্য পুত্র
ডঃ অজিতকুমার সাহা



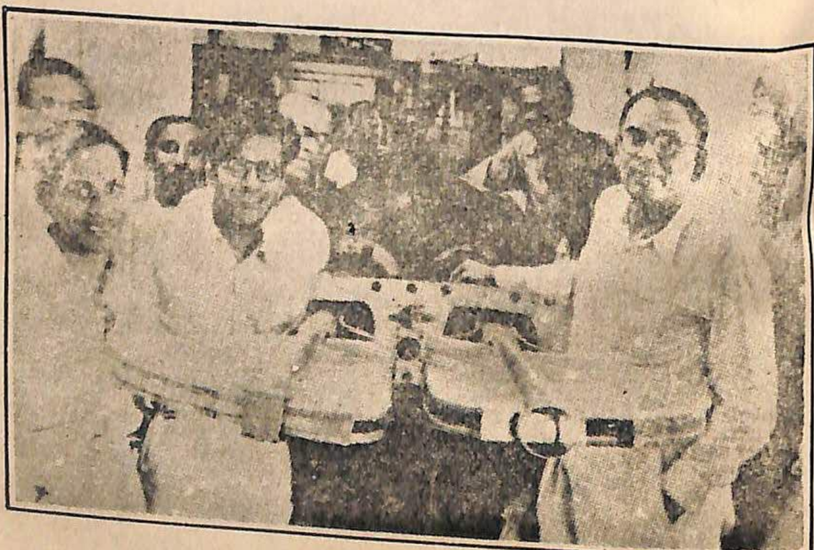
মেঘনাদ সাহার জন্মস্থান : শ্যাওড়াতলী গ্রামের বাড়ির বর্তমান ছবি



সিমুলিয়া মিড্‌ল স্কুল



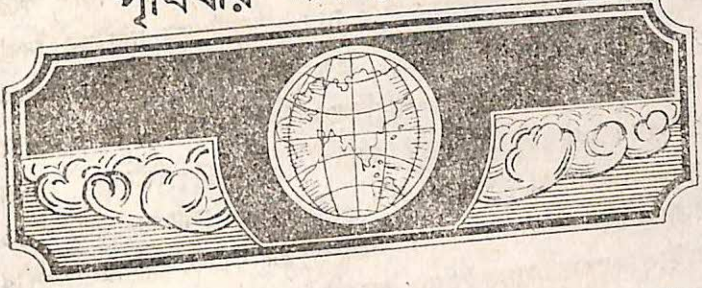
সিমুলিয়া মিড্‌ল স্কুলের পর মেঘনাদ সাহা ভর্তি হন কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে



ডঃ বি ডি নাগচৌধুরী ও ডঃ এ পি পাত্রের সঙ্গে সাইক্লোট্রন লেবরেটরীতে
(ডান দিকে)

এক

পৃথিবীর আকার ও অবস্থান



তোমরা সকলেই ভূগোলে পড়িয়াছ যে, পৃথিবী কমলালেবুর ন্যায় গোল এবং উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। কিন্তু কি করিয়া এই জ্ঞানের উৎপত্তি হইল, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না।

বাস্তবিক পক্ষে এখনও অনেক লোক আছে, যাহারা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর আদি অন্ত নাই, উহা থালার মত চ্যাপ্টা এবং উপরে যে নীল আকাশ আছে তাহা ছাদের মত পৃথিবীকে ঢাকিয়া আছে। অনেক পুরাকালের মানুষও এইরূপ বিশ্বাস করিত।

আদিম অবস্থায় মানুষ বর্তমান কালের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত না, তাহারা আহারের অন্বেষণে বনে-জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত এবং রাত্রি আসিলে জানোয়ারের ও ভূতের ভয়ে গুহায় লুকাইয়া থাকিত। পৃথিবী কত বড়, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার তাহাদের কৌতূহল ছিল না। তাহারা ছিল অনেকটা ছেলেদেরই মত ; ছেলেরা যেমন নিজের গ্রাম বা সহর ছাড়া বেশী কিছু জানে না, আদিম মানুষও তেমনি নিজে যে জঙ্গলে বা গুহায় থাকিত তাহা ছাড়া বেশী কিছু জানিত না।

ক্রমে মানুষ কৃষিকাজ শিখিল, কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন তৈয়ার করিতে শিখিল এবং অনেকে একত্র হইয়া গ্রাম ও নগর তৈয়ার করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের মধ্যে নানারকম ব্যবসায়ের লোকের উৎপত্তি হইল।

কেহ চাষের কাজ করিত, কেহ কেহ বা পশুপালন করিত ; অর্থাৎ গরু, মহিষ ভেড়া প্রভৃতি চরাইত এবং তাহাদের দুগ্ধে বা মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত। কেহ কেহ শিল্পকার্য শিখিল ; অর্থাৎ নৌকা বা গাড়ী তৈয়ারী, যুদ্ধ করার অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ারী অথবা কাপড়বোনা, বাসন কোসন তৈয়ার করা। আর এক শ্রেণীর লোক শিখিল ব্যবসায় বা বিনিময় করা। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে। যাহারা শিল্পকাজ করে, তাহারা খাবার জিনিস উৎপাদন করে না। তাহাদিগকে চাষীদের নিকট হইতে খাবার জিনিস কিনিতে হয়। এবং চাষীরা কাপড়চোপড়, বাসন কোসন নিজেরা তৈয়ার করে না, তাহাদিগকে উহা শিল্পীদের নিকট হইতে কিনিতে হয়। এই যে পরস্পরের তৈয়ারী জিনিসের বিনিময়, তাহা একশ্রেণীর লোক দিয়া সম্পাদন হয়। ইহারা চাষী লোকের নিকট হইতে শস্য ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া শিল্পীদের নিকট বিক্রয় করিত, আবার শিল্পীর নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র, কাপড় ইত্যাদি দরকারী জিনিস কিনিয়া চাষীদের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহাদিগকে বলিত বণিক।

প্রাচীনকালে এই বণিকেরা বাণিজ্য করিবার জন্য দেশ-বিদেশে যাইত। এই বাণিজ্য ছিল দুই রকম। এক ছিল স্থলপথে, আর এক ছিল জলপথে। বাণিজ্যের যোগাযোগ ক্রমে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, এক নগর হইতে অন্য নগরে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়িল। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বণিকেরা বহু দূর দেশে যাতায়াত করিত। এইরূপে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জানাশুনা আরম্ভ হইল। আমাদের দেশ হইতে অর্থাৎ বাঙলা হইতে বণিকেরা কাপড় রেশমী জিনিস ইত্যাদি লইয়া দক্ষিণ পাটন অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি সমুদ্রস্থ দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইত এবং সেখান হইতে গন্ধদ্রব্যাদি—যেমন লবঙ্গ, এলাচি, জায়ফল ইত্যাদি বোঝাই করিয়া দেশে ফিরিত। পশ্চিম দেশেও এইরূপ ক্রীট, মিশর, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিত।

অনেক দূরে যাইতে হইলে দিক্ নির্ণয় করা দরকার। স্থলপথে ইহা ততটা দরকার নয় যতটা জলপথে দরকার। কারণ, স্থলে অন্য লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পথ ঠিক করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে লোকে কি করিয়া জানিবে যে, তাহারা উত্তরে কি দক্ষিণে, পূর্বে কি পশ্চিমে চলিতেছে। আকাশে চন্দ্র বা সূর্য থাকিলে কতকটা দিক্ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে কি উপায় হইবে ?

ক্রমে লোকে শিখিল যে অন্ধকার রাত্রে তারা দেখিয়াও দিক ঠিক করা যায়। আমরা মেঘশূন্য অন্ধকার রাত্রিতে দেখিতে পাই যে, আকাশে অসংখ্য তারকা জ্বলজ্বল করিতেছে। আরও দেখিতে পাই যে, তারাগুলি ক্রমে পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে সরিতেছে। মনে কর, কালপুরুষ তারা ; ইহা তুমি সহজেই চিনিতে পার। অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পরে ইহাকে পূর্বদিকে দেখিবে, আবার শেষ রাত্রে ইহাকে পশ্চিমদিকে দেখিতে পাইবে। পর দিন সন্ধ্যাবেলায় ইহাকে পূর্বদিকে আবার দেখা যাইবে।

এখন ভাল করিয়া যদি দেখ, তাহা হইলে দেখিবে যে, সমস্ত তারাযুক্ত আকাশ দিবারাত্রির মধ্যে একবার চাকার মত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। কিন্তু চাকা বা লাটিম যখন ঘোরে, তখন একটা রেখার চারিদিকে ঘোরে। উহাকে বলে চাকার অক্ষরেখা বা axis। আকাশ যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, তাহাও পৃথিবীর মধ্যস্থ একটা রেখার চারিদিকে ঘোরে। কি করিয়া এই রেখা বাহির করিতে পার ?

ইহা অতি সহজ ব্যাপার। যখন তুমি লাটিম ঘোরাও, তখন ভাল করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিবে যে, চাকার পরিধিস্থ বিন্দুগুলি বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে, কিন্তু অক্ষরেখার উপরিস্থ বিন্দু একেবারে স্থির আছে।

আকাশ একটি গোলকের মত, তাহা যে-রেখার চারিদিকে ঘোরে, সেই রেখার শেষ বিন্দু যেখানে আকাশ ভেদ করিয়াছে সেই বিন্দু মোটেই ঘোরে বলিয়া মনে হয় না। এই স্থানে একটি ছোট তারা আছে, তাহাকে ধ্রুবতারা (Polar Star) বলে। এই ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া আর সমস্ত তারা দিন-রাতে একবার ঘুরিয়া আসে।

ধ্রুবতারা যে স্থির থাকে, তাহা একটু মন দিয়া কয়েকদিন আকাশ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। ধ্রুবতারার কিছু দূরে সাতটি তারা আছে। আমাদের দেশের পন্ডিতেরা তাহাদের নাম দিয়াছেন সপ্তর্ষি। তাঁহারা মনে করিতেন যে, পৃথিবীতে যে সব লোক খুব ভাল কাজ করিতেন, তাঁহারা মরিয়া গেলে দেবতারা খুসী হইয়া তাঁহাদিগকে উজ্জ্বল তারাতে পরিণত করিয়া আকাশে রাখিয়া দিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের পুণ্যের জোরে আকাশে জ্বল জ্বল করিয়া দীপ্তি পাইতেন।

আমাদের পুরাণে গল্প আছে যে, ধ্রুব এক রাজার ছেলে ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই খুব হরিভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া হরিঠাকুর

তাঁহাকে খুব বড় রাজা করেন এবং তিনি মরিয়া গেলে, তাঁহাকে তারা করিয়া আকাশে রাখেন। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে সমস্ত তারকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাতজন ঋষিও খুব জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁহারাও তারকা হইয়া আকাশে দীপ্তি পাইতেছেন। তাঁহারা ধ্রুবকে কেন্দ্র করিয়া দিবারাত্রে একবার ঘুরিয়া আসিতেছেন।

এই সাতটি তারার প্রথম দুইটিকে এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া রেখাটিকে উত্তরদিকে বাড়াইয়া দিলে ধ্রুবের খুব নিকট দিয়া চলিয়া যায়। এই দুইটি তারাকে সংস্কৃত ভাষায় ক্রতু ও পুলহ এবং ইংরাজীতে pointer বা পথ-প্রদর্শক বলে।

যদি তুমি গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলায় উত্তরদিকে দেখ তাহা হইলে সপ্তর্ষিকে আকাশে অবস্থিত দেখিতে পাইবে। যদি আবার রাত্রি ১২টায় দেখ, তাহা হইলে উহাকে অন্যরকম দেখিবে। রাত্রি ৪টার সময় উহার চিত্র আবার বদলাইয়া যাইবে।

ইহা হইতে তুমি স্পষ্টই বুঝিবে যে, ধ্রুবতারা স্থির আছে এবং পথ-প্রদর্শক তারা দুটি ঘড়ির কাঁটার মত ২৪ ঘণ্টায় একবার উহার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতেছে। একটু মনোযোগ দিয়া সপ্তর্ষির গতি কয়েকদিন ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, তারাগুলি তাহার উল্টোদিকে ঘোরে। আকাশের সমস্ত তারাই এইরূপে ধ্রুবের চারি-দিকে ঘুরিতেছে—দিবারাত্রে একবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়।

আকাশ-গোলকের অক্ষরেখা ঃ—যদি ধ্রুব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত একটি রেখা টান, তাহা হইলে উহা আকাশ-গোলকের অক্ষরেখা হইবে। আকাশ-গোলক এই রেখার চারিদিকে দিবারাত্রিতে একবার লাটিমের মত ঘুরিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর যে স্থান হইতেই ধ্রুবের দিকে রেখা টান, ঐ রেখার দিক্ একই হইবে, কারণ, ধ্রুব অনন্ত দূরে অবস্থিত।

এই ধ্রুবতারা তোমাকে চিনাইবার উদ্দেশ্য এই যে, এই তারা ঠিক উত্তর দিকে থাকে। তোমরা পুস্তকে পড়িয়াছ যে, যেদিকে সূর্য উঠে সেই দিকই পূর্ব দিক। পূর্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে বাঁ হাত যেদিকে থাকে তাহা উত্তর দিক। ইহা মোটামুটি ঠিক, কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মে সত্য নয়। কারণ, তোমরা বোধ হয় জান যে, শীতকালে সূর্য দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়,

গ্রীষ্মকালে মাথার উপর আসিয়া পড়ে। কাজেই, সূর্য বৎসরের সকল ঋতুতে ঠিক পূর্ব দিকে উঠে না।

প্রাচীনকালে বণিকেরা যখন পণ্যদ্রব্য বড় বড় নৌকায় বোঝাই করিয়া সমুদ্রের পরপারে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তখন তাঁহাদিগকে দিন-রাত নৌকা চালাইতে হইত। রাত্রে ধ্রুবতারাই তাঁহাদের দিক নির্ণয়ের একমাত্র উপায় ছিল।* এইরূপে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ধ্রুব ও তাঁহার চতুর্দিকস্থ সমস্ত তারার সহিত পরিচিত হইলেন।

ক্রমে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, যতই তাঁহারা দক্ষিণে যাইতে থাকেন, ধ্রুবতারা যেন ততই নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। কলিকাতায় ধ্রুবতারা আকাশের অনেকটা উপরে, কিন্তু লঙ্কাদ্বীপে ধ্রুবতারা প্রায় ক্ষিতিজতলের† উপর উপস্থিত।

ধ্রুবতারা ক্ষিতিজতল হইতে কতটা ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তাহা উত্তর বিন্দু হইতে ধ্রুবের উন্নতি দ্বারা মাপ করা যায়। কলিকাতায় উন্নতির পরিমাণ ২৪° ডিগ্রী, লঙ্কায় মাত্র ৮° ডিগ্রী। যদি আরও উত্তরে যেমন বিলাতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে উন্নতি আরও বাড়িয়া যায়। উত্তর মেরুতে ধ্রুব ঠিক মাথার উপর ঊর্ধ্ব বিন্দুতে আসে। এখানে উন্নতি ৯০°।

এখন সেকালে যে সকল চিন্তাশীল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ক্রমে দক্ষিণদেশে গেলে 'ধ্রুবতারা' নীচে নামিতে থাকে কেন? পৃথিবী যদি চ্যাপ্টা, সমতল ও অসীম বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে কখনই এরূপ হইতে পারে না। তখন ধ্রুব সর্বত্রই এক দিকেই দৃষ্ট হইবে, কারণ সমস্ত তারাই অনন্ত দূরে অবস্থিত।

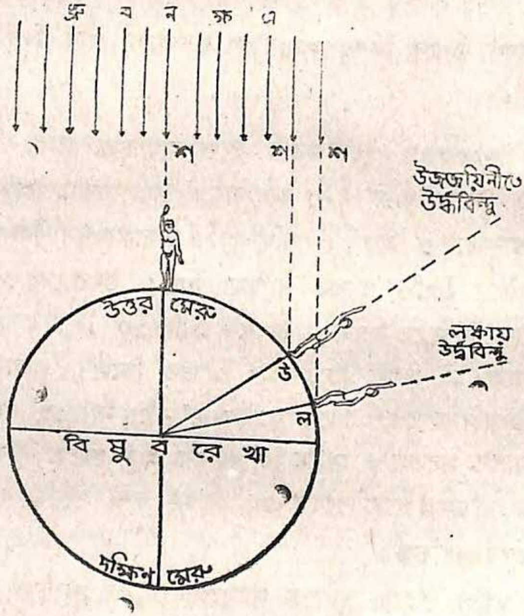
ক্রমে চিন্তা করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, পৃথিবীকে যদি গোল এবং সসীম ধরা যায়, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হয়। এই ব্যাপার পরপৃষ্ঠার চিত্রে বোঝান যাইতেছে।

---

* এক সময়ে হিন্দু নাবিকেরা দিশাকাক ও কবুতর দিয়া দিক্ ঠিক করিতেন। দিশাকাক অর্থাৎ যে কাক সংস্কার হইতে কোন্ দিকে ডাঙ্গা আছে, তাহা ঠিক করিয়া সেইদিকে উড়িয়া যাইত। কাক যে দিকে উড়িত, বণিকেরা সেইদিকে নৌকা চালাইত।

† ক্ষিতিজতল—যেখানে পৃথিবী আকাশের সহিত মিশিয়াছে মনে হয়। ইংরেজী Horizontal plane.

মনে কর পৃথিবী গোল, এবং (২য় চিত্র দেখ) 'শর' চিহ্নিত রেখাগুলি দ্বারা ধ্রুবতারা প্রদর্শিত হইতেছে। ধ্রুবতারা অনন্ত দূরে আছে। কাজেই, পৃথিবীর সমস্ত জায়গা হইতেই উহাকে একই দিকে দেখা যাইবে। এখন পৃথিবীর উপর 'ল' (অর্থাৎ লঙ্কা) চিহ্নিত স্থানের অর্থাৎ ধ্রুবকে কিরূপ অবস্থায় দেখিবে ? তাহারা দেখিবে যে, ধ্রুব ঠিক মাথার উপরের বিন্দু হইতে বহু নীচে আছে, অর্থাৎ প্রায় ক্ষিতিজতলের উপর। ২য় চিত্রে একটি ছোট ছেলেকে দিয়া ইহা দেখান যাইতেছে। ছেলেটি ঊর্ধ্ববিন্দুর দিকে হাত তুলিয়া ধ্রুবের দিকে (শ) চাহিয়া আছে। কিন্তু 'উ'তে (অর্থাৎ উজ্জয়িনীতে) তাহার ঊর্ধ্ব-



গোল বৃত্তটি পৃথিবী। অবশ্য বাস্তবিক পৃথিবী অনেক বড়। একটি ফুটবলের উপর ছোট পিঁপড়ে রাখিলে যেমন দেখা যায়, পৃথিবীর তুলনায় ছেলেটি তাহা হইতেও হাজার গুণ ছোট হইবে।

বিন্দু সরিয়া আসিয়াছে এবং 'শ' অনেকটা কাছে আসিয়াছে। যখন তাহারা 'ম'তে আসিবে, তখন ধ্রুবকে ঠিক মাথার উপরে দেখিতে পাইবে।

সুতরাং কি জন্য উত্তর দিকে গেলে ধ্রুব ক্রমশঃ মাথার উপরে উঠে এবং দক্ষিণে গেলে নীচে নামে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিলে।

এখন একটু গণিত প্রয়োগ করিলেই পৃথিবীর আয়তনের পরিমাণ করা যায়। তোমরা বোধ হয় জান যে, এক সমকোণে ৯০° ডিগ্রী হয় এবং কোন বৃত্তের

চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিলে ৩৬০° হয়। একটু গণিত লাগাইলেই দেখিতে পাইবে যে, 'ল' হইতে 'উ'-তে যাইতে ধ্রুব যতটা উঠিয়া গিয়াছে তাহা ডিগ্রিতে পরিমাণ করিলে 'ল ও উ' কোণের সমান হয়। মনে কর, এইরূপ পরিমাণ করিয়া জানিলাম যে, 'ল' ও উ ৮° ডিগ্রি। তখন আবার পৃথিবীর উপর দিয়া জরীপ আরম্ভ করিলাম। জরীপ করিয়া পাইলাম যে, ল হইতে উ পর্যন্ত দূরত্ব ৫৫২ মাইল। এখন অতি সহজে পৃথিবীর পরিধি বাহির করা যায়। ৮° ডিগ্রিতে যদি ৫৫২ মাইল হয়, ৩৬০° ডিগ্রীতে কত মাইল হইবে? উত্তর (৩৬০×৫৫২÷৮)= ২৪৮৪০ মাইল। অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল। পরিধি জানিলে ব্যাসার্ধ বাহির করা যায়। পরিধিকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ৪৪ দিয়া ভাগ দিলে ব্যাসার্ধ পাওয়া যায়। গণনা করিয়া দেখ, ৪,০০০ মাইল।

এইরূপ প্রমাণ প্রয়োগ ও গণনা করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আয়তন নিরূপণ করেন। মিশর দেশে কি করিয়া প্রথমে পৃথিবীর মাপ হয়, তাহা বলিতেছি।

তোমরা বোধ হয় জান যে, মিশর দেশ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বিখ্যাত। এই দেশের ভিতর দিয়া নীল নদ দক্ষিণোত্তরে প্রবাহিত। নীল নদ দৈর্ঘ্যে প্রায় চার হাজার মাইল। প্রায় দশ হাজার বৎসর ধরিয়া মিশর দেশে সভ্য জাতি বাস করিতেছে। খৃস্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে এই দেশের রাজধানী ছিল সাগরোপকূলস্থ আলেকজান্ড্রিয়া নগরী এবং সেই স্থানে টলেমী (Ptolemy) বংশীয় যবন (গ্রীক) রাজারা রাজত্ব করিতেন। এই যবন রাজারা বিদ্বান্ লোকদিগকে খুব আদর করিতেন। তাঁহারা বিদ্বান লোকেদের পড়াশুনা এবং গবেষণার সুবিধার জন্য এক বিখ্যাত পরিষদ (Museum)* গঠন করেন।

এই পরিষদের পণ্ডিতেরা অনেক বিদ্যার চর্চা করিতেন। তোমরা যে ইউক্লিড (Euclid)-এর জ্যামিতি পড়, সেই ইউক্লিড এই বিজ্ঞান-মন্দিরের সভ্য ছিলেন। এইস্থানে আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। —ইরাটস্থেনস (Eratosthenes)। তিনি রাজধানী আলেকজান্ড্রিয়া (Alexandria) হইতে দক্ষিণদিকে জরীপ করিতে করিতে দূরে সিয়েন (Syene) সহরে চলিয়া যান

* Museum অর্থে এখন 'যাদুঘর' বোঝায়। যেখানে অনেক 'আজব' জিনিস রাখা হয়। কিন্তু ইহার প্রাচীন অর্থ ছিল বিদ্যাদেবীদের মন্দির। গ্রীকেরা মনে করিতেন যে, Nine Muses অর্থাৎ নয়জন বিদ্যাদেবী সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে বিদ্যালাভ হইত।

এবং ধ্রুবের উন্নতি নিরূপণ করিয়া পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর পরিধি ২৫০,০০০ (Stadia) বা ৪৬,২৪৮ কিলোমিটার। বর্তমানেও সমস্ত সভ্য দেশেই জরীপ বিভাগ আছে। তাঁহারা মাপজোক করিয়া বাহির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর পরিধি ৪০,০০৭.৫ কিলোমিটার এবং ব্যাসার্ধ ৩,৯৫৮ মাইল। প্রাচীনকালে আরও অনেক সভ্যজাতি পৃথিবীর মাপ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র (বর্তমান পাটনা) নগরে ৪৭৬ খৃস্টাব্দে গুপ্তসম্রাট্‌দের রাজত্বকালে আর্যভট নামক প্রসিদ্ধ পন্ডিত বর্তমান ছিলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর পরিধি ৩,৩০০ যোজন।

যোজন কত বড়, তাহা জানা নাই, যদি যোজন আট মাইল হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর পরিধি ২৬,৪০০ মাইল। এই পরিমাপে খুব বেশী ভুল নাই। কিন্তু কি করিয়া হিন্দু পণ্ডিতগণ এই মাপ বাহির করেন, তাহা এখন আর জানা যায় না। তবে মনে হয় যে, তাঁহারাও গ্রীকদের মত মাপ করিতে করিতে উজ্জয়িনী হইতে দক্ষিণে কোন জায়গায় চলিয়া যান এবং দুই স্থানের ধ্রুবের উন্নতির তফাৎ নিরূপণ করেন।

৯ম শতাব্দীতে আরবজাতীয় লোকেরা খুব সভ্য হইয়া উঠে। খলিফা আলমামুনের রাজত্বকালে রাজধানী বাগদাদ নগরের পণ্ডিতগণ জরীপ করিয়া ঠিক করিয়া পৃথিবীর পরিধির মাপ খুব শুদ্ধভাবে বাহির করেন।

পৃথিবী যদি গোল হয়, তাহা হইলে আর অসীম হইতে পারে না। যদি আমরা পৃথিবীর একস্থান হইতে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে চলিতে থাকি, তাহা হইলে ঘুরিয়া আবার সেই জায়গাতেই ফিরিয়া আসিব।

উপরের লেখা হইতে বুঝিতে পারিতেছ যে, বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী অসীম নয়। ইহার পরিধি বা বেড় প্রায় ২৫,০০০ মাইল। যদি পৃথিবীর উপর দিয়া ঠিক্ মাঝামাঝি একটি রেলপথ পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া নির্মিত হয়, তাহা হইলে উহা লম্বায় হইবে ২৫,০০০ মাইল। যদি রেলগাড়ী ঘণ্টায় ২৫ মাইল যায়, তাহা হইলে উহা অনবরত চলিয়া ১,০০০ ঘন্টায় বা প্রায় ৪২ দিনে পৃথিবী সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসিতে পারে। উড়ো জাহাজে আরো জোরে—প্রায় ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে চলিতে পারে। উড়ো জাহাজে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ক্রমাগত পূর্বদিকে চলিলে ৭ দিনের মধ্যেই পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসা যায়।

পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা

পৃথিবী গোল, এই জ্ঞান অতি পুরাকালে পণ্ডিতদের মধ্যে মান্য হইলেও সাধারণ লোকে ইহা বহুদিন বিশ্বাস করে নাই। কারণ, তাহারা দেখে যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা ও অসীম। তাহারা পণ্ডিতদের কথা বিশ্বাস করিবে কেন? যেহেতু সাধারণ লোকের মধ্যে লেখাপড়া ততটা প্রচলিত ছিল না এবং তাহারা গণিতের তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ ছিল না। আর এক প্রধান কারণ এই যে, পুরোহিত শ্রেণীর লোকে এই তত্ত্ব লোক-সাধারণে প্রচার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবসায়টি মারা যায়। তাঁহারা লোককে বুঝাইতেন যে, পৃথিবী অসীম এবং দেবতারা তাঁহাদেরই দেশে পর্বতাদির উপর বাস করেন। যেমন, প্রাচীন গ্রীকেরা মনে করিতেন, দেবতারা তাঁহাদের দেশের উত্তরস্থ ওলিম্পস্ পর্বতে বাস করেন এবং সেই স্থানে দেবরাজ জুপিটার অন্য সমস্ত দেবতাদিগকে লইয়া খুব ঘটা করিয়া দরবার করিতেন এবং মানুষের ভাগ্য নির্ণয় ও পাপপুণ্যের বিচার করিতেন। কিন্তু দিবারাত্রি কি করিয়া হইত? তাঁহারা মনে করিতেন, সূর্যদেবতা 'অ্যাপোলো' জুপিটারের আদেশে অশ্ববাহিত রথে চড়িয়া রোজ আকাশে চক্কর দিয়া আসিতেন এবং সন্ধ্যা হইলে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আটলাণ্টিক মহাসাগরের শীতল জলে ডুব মারিতেন। যতক্ষণ তিনি আকাশে ঘুরিতেন, ততক্ষণ ছিল দিন, যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিতেন, ততক্ষণ ছিল রাত্রি। এই দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার ভার ছিল 'পুরোহিতদের' উপর। তাঁহারা পূজা-অর্চনা করিলে দেবতা তুষ্ট হইতেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। পৃথিবী যদি গোল ও অসীম প্রমাণ হয় এবং ওলিম্পস্ পর্বত তাহার উপর একটি ছোট পাথরের ঢিপি বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে লোকে আর দেবতাদিগকে মানিবে না এবং দেবতাদের দালাল পুরোহিতদিগকেও মানিবে না। সুতরাং পুরোহিত শ্রেণীর লোকে পৃথিবীর তত্ত্ব সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। গ্রীকরা মনে করিতেন গ্রীকদেশ ও ভূমধ্যসাগর পৃথিবীর কেন্দ্র এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরের অসীম জলরাশি চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহারা আমেরিকা, চীন, প্রশান্ত মহাসাগর ইত্যাদির অস্তিত্ব জানিতেন না। প্রাচীন হিন্দুদেরও পৃথিবী সম্বন্ধে তেমন ঠিক ধারণা ছিল না। তাঁহারা ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ বলিতেন এবং মনে করিতেন যে, পৃথিবী থালার মত চ্যাপ্টা ও গোল এবং পৃথিবীর ব্যাসের সমান উচ্চ সুমেরু পর্বত উহার কেন্দ্রে অবস্থিত। তাঁহারা আরও মনে করিতেন যে, সুমেরু পর্বতের চারিদিকে

সূর্যদেব সপ্তাশ্ববাহিত রথে দিবরাত্রিতে একবার ঘুরিয়া বেড়ান এবং যখন তিনি সুমেরুর উত্তর দিকে যান, তখন দক্ষিণ দিকে সুমেরুর ছায়া পড়িয়া রাত্রি হয়, দক্ষিণ দিকে আসিলে দিন হয়।

অন্যান্য দেবতারা—যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি সুমেরু পর্বতের উপর চারিদিকে পুরী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন, এই তাঁহাদের ধারণা ছিল। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ যে, কি করিয়া দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হয়। পুরাকালের জাতিদের মধ্যে এই ব্যাপারটি একটা মহাসমস্যার বিষয় ছিল। গ্রীক্‌দের অ্যাপোলো বা সূর্যদেবতার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সূর্য সন্ধ্যা-বেলায় আটলাণ্টিক মহাসাগরে ডুব মারিতেন কিন্তু আবার কি করিয়া ১২ ঘণ্টা পরে পূর্বে আসিয়া হাজির হইতেন, সে-বিষয়ে পুরাকালের লোকেরা অনেক গল্প রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন মিশর দেশের লোকেরা বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবী দেবতা চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন এবং অন্তরীক্ষ দেবী হাত ও পা মাটিতে রাখিয়া কুণ্ডলাকারে উপুড় হইয়া আছেন।

সূর্য-দেবতা 'রা' আকাশদেবীর পিঠের উপর দিয়া পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্রে যান, এবং সমুদ্রে খেয়া নৌকায় চড়িয়া পৃথিবী পুরুষের মাথার কাছে উপস্থিত হন। পৃথিবী-পুরুষ সূর্যকে হাত দিয়া পূর্বাচলের শিখরে আনয়ন করেন। তিনি সেখানে আবার খেয়া নৌকায় চড়িয়া পূর্ব-সমুদ্র পার হইয়া উপকূলে পৌঁছিয়া অন্তরীক্ষ দেবীর পিঠের উপর পায়চারি আরম্ভ করেন।

যদি আমরা মনে করি যে, পৃথিবী ফুটবলের ন্যায় গোল এবং স্থির এবং আকাশগোলক সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি লইয়া ধ্রুবকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর চারিদিকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতেছে, তাহা হইলে আর এই সমস্ত কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। আকাশের ঘূর্ণনের জন্য সূর্য ২৪ ঘণ্টা পর পর একবার পূর্ব দিকে আসিবে, ১২ ঘণ্টা পর পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে, অথবা পৃথিবীর অপর পিঠে চলিয়া যাইবে। সুতরাং পৃথিবী স্থির, এবং আকাশের ঘোরার জন্য দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হইতেছে। এই


টলেমী

মত প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এবং গ্রীক-পণ্ডিত টলেমী (ইনি পূর্ব বর্ণিত রাজা টলেমী নন্) খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (প্রায় ১৯০০ বৎসর পূর্বে) পশ্চিম দেশে এই মত প্রচলিত করেন। টলেমী আলেক্জান্দ্রিয়া বিজ্ঞানপরিষদের সদস্য ছিলেন। টলেমীর মত ১৪০০ বৎসর ধরিয়া সত্য বলিয়া মানা হইত। পরে ১৪৭৬ খৃঃ অব্দে পোলাণ্ডদেশীয় কোপার্নিকস্ নামক একজন সন্ন্যাসী পণ্ডিত এই মত পরিবর্তিত করেন।

কিন্তু এই মত সত্য হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, পৃথিবী শূন্যে বর্তমান আছে। আদিম কালের মানুষ এই ধারণা করিতে পারিত না। তাহারা দেখিত, শূন্যে কোন জিনিসই থাকিতে পারে না, নীচের দিকে পড়িয়া যায়। শূন্যে কিছু রাখিতে হইলে একটা আধার বা অবলম্বন দরকার। যেমন যদি আকাশে নিশান উড়াইতে চাও, তাহা হইলে বাঁশের উপর সেই নিশানকে রাখিতে হয়। আদিম মানুষ মনে করিত যে, পৃথিবীও কোন আধারের উপর আছেন। প্রাচীন হিন্দুরা মনে করিতেন, চারটি হাতী (দিগ্গজ, মতান্তরে আটটি) পৃথিবীকে দাঁতের উপর রাখিয়াছে। হাতী চারটি আবার এক কচ্ছপের উপর দাঁড়াইয়া আছে, কচ্ছপটি (কূর্ম অবতার) আবার জলে ভাসিতেছে। অন্য মতে পৃথিবী সাপের হাজার ফণার একটি ফণার উপর আছে। এরূপ মনে করিবার কারণও ছিল। তখন এবং এখনও মাঝে মাঝে পৃথিবী হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে এবং ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। এই ব্যাপারকে বলে ভূমিকম্প। ভূমিকম্প বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। অনেক সময় ভূমিকম্পে গ্রাম, নগর, দেশ ভাঙিয়া চুরিয়া উৎসন্ন হইয়া যায়। যেমন, ১৯২৪ সনের ভূমিকম্পে জাপানের রাজধানী টোকিও নগর উৎসন্ন হইয়া যায় এবং প্রায় ৫০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আদিমকালের লোক কল্পনা-জল্পনা করিত, আচ্ছা ভূমিকম্প হয় কেন? তাহারা মনে করিত, পৃথিবীর বাহন সহস্র ফণাযুক্ত অনন্ত নাগ মহাশয় মাঝে মাঝে পৃথিবীর বোঝা বহিতে বহিতে শ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং শ্রান্তি দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে পৃথিবীকে তাহার এক ফণা হইতে অন্য ফণায় সরাইয়া লন, সুতরাং পৃথিবী নড়িয়া উঠে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই সম্বন্ধে নানান বিচিত্র ধারণা ছিল।

পৃথিবী কি শূন্যে বর্তমান আছে

বলা বাহুল্য যে, এই মত মোটেই ঠিক নয়। এই সমস্ত ধারণা লইয়া চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অনেক ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে

দক্ষিণ দেশে ভাস্করাচার্য নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—আচ্ছা মানিলাম যে, পৃথিবী নাগের ফণায় আছে। কিন্তু সেই নাগ কোন আধারের উপর আছে ? সেই নাগকে ধারণ করার জন্য অন্য আধারের দরকার। মনে করিলাম নাগ আছে হাতীর উপর। কিন্তু ইহাতেই শেষ হইল না—হাতী থাকিবে কিসের উপর ? সুতরাং এক আধারের কল্পনা করিতে যাইয়া অনন্ত আধারের কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ অদ্ভুত কল্পনার দরকার কি ? ধরিয়া লও যে, পৃথিবীর কোন আধার নাই, উহা গোল ও উহার চারিদিকেই আকাশ। যদি বল যে, পৃথিবী নীচের দিকে পড়িয়া যায় না কেন ? তাহার উত্তর, পৃথিবীর চারিদিকেই আকাশ, সুতরাং পৃথিবী পড়িবে কোথায় ? সুতরাং এই কথাই সত্য যে, পৃথিবী নিরাধার, এবং উহার চারিদিকেই আকাশ। সমস্ত দ্রব্য পৃথিবীর দিকে পড়ে, কারণ, পৃথিবী উহাদিগকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে কে ? সুতরাং পৃথিবী কোন দিকেই পড়িতে পারে না।

পৃথিবী যে গোলাকার এবং নিরাধার এই মত পণ্ডিতদিগের মতে গ্রাহ্য হইলেও প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত এই মত সাধারণ লোকে গ্রহণ করে নাই। ১৪৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের জনসাধারণ বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবী অসীম এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরের পার নাই। ইউরোপের লোকে জানিত যে, পূর্বদিকে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ আছে কিন্তু সেই সমস্ত দেশের পরপারে কি আছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহাদের ছিল না। তাহারা পুরাতন গ্রীকদের মত মনে করিত যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর পৃথিবীর স্থলভাগের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে।

পৃথিবীর গোলত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ—কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার

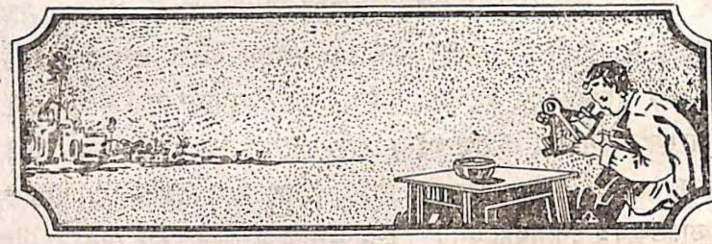
এই সময়ে চীন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পূর্ব দেশ হইতে জিনিস-পত্র স্থলপথে পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া ইতালি দেশের ভেনিস্, জেনোয়া ইত্যাদি নগরে আসিত এবং ভেনিসের বণিক্‌গণ তাহা পশ্চিম ইউরোপের (স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের) বণিক্‌দের নিকট বিক্রয় করিতেন। পশ্চিম ইউরোপের বণিকেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতেন। ১৪৯০ খৃস্টাব্দে কলম্বস্ নামক একজন জেনোয়া নগরবাসী বণিক্ স্পেন দেশের রাজা ও রাণীর

নিকট প্রস্তাব করেন যে, পূর্বদিকের পন্থাই ভারতবর্ষে যাইবার একমাত্র পন্থা তাহা নয়, ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে গেলেও ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যাইবে। কারণ, পৃথিবী যদি গোলাকার হয়, তাহা হইলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পার আছে এবং ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে চলিলে আমরা স্পেন হইতে আটলাণ্টিক মহা-সাগরের পরপারে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতে পারিব এবং ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া পুনরায় স্পেনে উপস্থিত হইতে পারিব। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা কলম্বাসের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে যাইবার জন্য তিনখানা ছোট জাহাজ দেন। কলম্বস্ সেই তিনখানা জাহাজ লইয়া স্পেন হইতে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া তিন মাস পরে স্থল দেখিতে পান। তিনি প্রথমে মনে করেন যে, বাস্তবিক তিনি ভারতবর্ষেই পৌঁছিয়াছেন। সেই জন্য সেই দেশের নাম দেন Indies (বর্তমানে West Indies)।

কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিমতীরস্থ দেশ ভারতবর্ষ নয়, সম্পূর্ণ নূতন দেশ, যাহাকে এখন আমেরিকা বলে। আমেরিকার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে জাপান ও চীন দেশ। জাপান ও চীনের পশ্চিমে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইউরোপ। সুতরাং তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, ইউরোপ হইতে ক্রমে পশ্চিম দিকে চলিয়া আবার ইউরোপে পেঁছান যায়। ম্যাগেলান (Magellen)-নামক পর্টুগালদেশীয় নাবিক্ প্রথমে (১৫১৯ খৃঃ অব্দে) এইরূপে পৃথিবী ঘুরিয়া আসেন। এই বিবরণ হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে পণ্ডিতেরা বহু দূরে না যাইয়াও বুদ্ধির বলে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী গোলাকার, এবং তাঁহারা তাহার পরিমাপ প্রায় ঠিক-ঠিক বাহির করেন। পরে ম্যাগেলান প্রভৃতি নাবিক্‌গণ জাহাজে একই দিক্ দিয়া চলিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে সমর্থ হন, এবং এই মত যে ঠিক, তাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রমাণ করেন। তুমি যদি হাজার দশেক টাকা খরচ করিতে পার, তাহা হইলে বিলাতের টমাস কুক্ কোম্পানী তোমাকে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবার টিকিট দিবেন।

দুই

যন্ত্র-বিজ্ঞান



[পৃথিবীর বুকে যে শিক্ষা ও সভ্যতা আজকাল আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। মানুষ দিন দিন যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া নানা দিক দিয়া আপনার সুখ ও সৌভাগ্যের পথ খুঁজিয়া পাইল। এইভাবেই অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ; এইভাবেই রেলগাড়ী, স্টীমার, জাহাজ ; এইভাবেই ব্যোমযান ও হাওয়াই জাহাজ, তারবার্তা, তারবিহীন বার্তা—এ সকল সে আবিষ্কার করিয়া একদিন যাহা অসম্ভব ছিল, তাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। তোমরা হয়ত খবরের কাগজে পড়িয়াছ যে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা Everest-এর উচ্চতা ২৯০০২ ফুট। কিন্তু এখনও কেহ গৌরীশঙ্করের চূড়ায় চড়িতে পারে নাই এবং যখন উহার উচ্চতা মাপা হয়, তখন কেহ উহার ১০০ মাইলের মধ্যেও যাইতে পারে নাই। কি করিয়া নিখুঁতভাবে এত দূরে থাকিয়াও উক্ত শৃঙ্গের উচ্চতা মাপা যায়, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকে খুবই অজ্ঞ। এই প্রবন্ধে দূরস্থ জিনিসের উচ্চতা মাপিবার কৌশল কি করিয়া ক্রমে ক্রমে মানুষ উদ্ভাবন করিল, গল্পচ্ছলে তাহা বলা হইয়াছে।]

উচ্চতা-মাপক যন্ত্র

কোনও দেশে অতি বিচক্ষণ ও সর্বকার্যে দক্ষ একজন রাজা ছিলেন। অন্যান্য রাজাদের মত তিনি অসার আমোদ-প্রমোদে বৃথা সময় নষ্ট করিতেন

না। তাঁহার মন্ত্রীও তাঁহারই মত অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। সুবিধা পাইলেই রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত কাজ নিজেদের চক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতেন। মাঝে মাঝে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া প্রজারা তাঁহার শাসন সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করে, তাহার খোঁজ-খবর লইতেন।

অন্যান্য রাজাদের যেমন হইয়া থাকে, এই রাজারও নানাশ্রেণীর ভৃত্য ছিল এবং তাহারা নিজ নিজ কাজের অনুযায়ী নানারূপ বেতন পাইত। প্রধানমন্ত্রী সকলের চেয়ে বেশী বেতন পাইতেন। তাঁহার নীচে বড় বড় কর্ম্মচারীরা ৫০০ হইতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাইতেন। সাধারণ কর্মচারীরা ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত পাইত এবং সাধারণ ভৃত্যেরা—যাহারা ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা, জল তোলা এবং ফরমাইস খাটা ইত্যাদি কাজ করিত, তাহারা দশ হইতে বিশ টাকা পর্যন্ত মাসে বেতন পাইত।

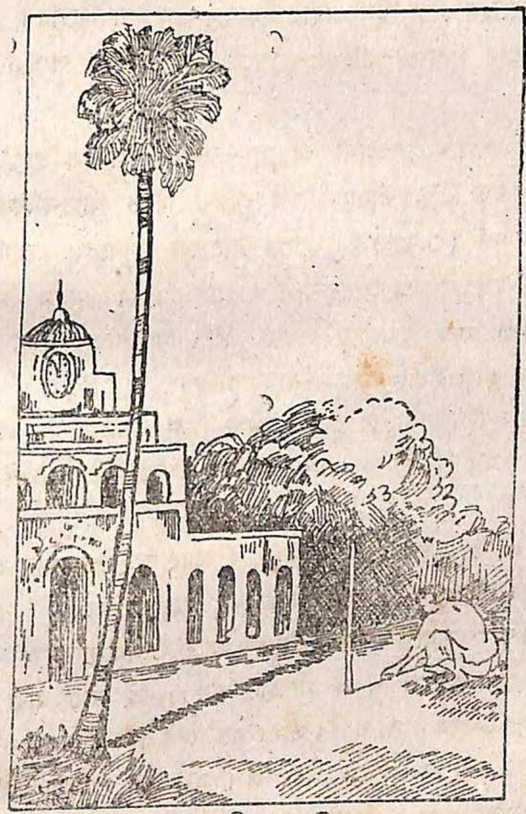
একদিন রাজা মন্ত্রীর সহিত ছদ্মবেশে চাকরদের ঘরের নিকট দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাহারা খুব জটলা করিয়া রাজার কাজের আলোচনা করিতেছে। একজন বলিতেছে—দেখ ভাইসকল, মহারাজের কি ঘোর অবিচার! আমাদিগকে সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয়, আর মহারাজা আমাদিগকে বেতন দেন মাত্র দশ হইতে পনের। আর কেরাণীবাবুরা শুধু চেয়ারে বসিয়া কলম চালান, তাঁহারা আমাদের পাঁচ ছয় গুণ বেতন পান, আর বড় বড় কর্মচারীরা ত কিছুই করেন না। মন্ত্রী মহাশয় শুধু মহারাজের সাথে গল্প করেন এবং হুকুম জারী করেন; আর তিনি যে কত হাজার টাকা বেতন পান, তাহা কেহ গণিয়া বলিতে পারে না।

রাজা এবং মন্ত্রী উভয়েই এই সমস্ত কথা শুনিলেন। কিন্তু তখন চাকরদের কিছু না বলিয়া পর দিন দরবারে তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সকলে আসিলে পর মন্ত্রী বলিলেন—তোমরা কাল রাত্রে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেছিলে যে, তোমরা সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম কর ও মহারাজ তোমাদের তেমন বেতন দেন না। সেইজন্য মহারাজ তোমাদের দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই হেতু তোমাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি একটি সমস্যা উত্থাপন করিয়া তোমাদের প্রত্যেককে তাহা সমাধান করিতে দিয়াছেন। তাহা এই—রাজবাটীর সম্মুখে অতিশয় পুরাতন এবং উচ্চ তালগাছটি কত উঁচু তাহা বাহির করিতে হইবে। ইহার জন্য তোমাদিগকে তিন দিন সময় দেওয়া হইল।

ইহা শুনিয়া চাকরদের মধ্যে মহা ভয় উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, কি করিয়া তালগাছের উচ্চতা মাপা যাইতে পারে। একজন বলিল—একটি খুব বড় মই তৈয়ারী করিয়া গাছের মাথায় চড়ি। তারপর সেইখান হইতে সুতা ফেলিয়া তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিতে পারিব। কিন্তু রাজবাড়ীর সূত্রধর বলিল যে, অতবড় মই তৈয়ারী করা সম্ভবপর নয়। তখন অন্য একজন ভৃত্য বলিল—আচ্ছা, এস আমরা ঐ তালগাছের সমান উঁচু একটি মাটির দেওয়াল তৈয়ারী করি। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, এই রকম দেওয়াল প্রস্তুত করিতে অনেক বৎসর লাগিবে এবং অনেক হাজার টাকা লাগিবে। আর একজন বলিল—আমাদের মধ্যে কেহ কোমরে সুতা বাঁধিয়া তালগাছের উপরে উঠুক্ এবং সুতা কত লম্বা, তাহা মাপিয়া দেখিলেই তালগাছের উচ্চতা বাহির করা যাইবে। কিন্তু এমন উঁচু তালগাছে চড়িতে পারে এমন কোন লোক পাওয়া গেল না। সুতরাং তাল গাছ না কাটিয়া কিরূপে তাহার উচ্চতা বাহির করিতে পারা যাইবে, চাকরেরা তাহা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। তখন তাহারা রাজদণ্ডের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তিন দিন কাটিয়া গেলে মহারাজ তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভয়ে ভয়ে তাহারা দরবারে উপস্থিত হইল। তখন প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—তোমরা কি তালগাছের উচ্চতা নিরূপণ করিতে পারিলে? চাকরেরা ভয়ে ভয়ে বলিল—না মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও তালগাছের উচ্চতা বাহির করিতে পারিলাম না। তখন মন্ত্রী মহাশয় একজন সাধারণ কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এই তালগাছটি কত উঁচু, না কাটিয়া তাহা বলিয়া দিতে পার? সে খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—এই কাজ দুই রকমে হইতে পারে। যদি একজন খুব ভাল তীরন্দাজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ তালগাছের মাথা লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুঁড়িতে হইবে। তীরের নীচের দিকে একটি শক্ত সুতা বাঁধা থাকিবে। তীরন্দাজ যদি ঠিক গাছের মাথায় তীর বিংধ করিতে পারে, তাহা হইলে সুতা লম্বভাবে মাটি পর্যন্ত পেঁাছিবে, এবং তখন ঐ সুতা মাপিলেই গাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করা যাইবে। কিন্তু সকলে বলিল, তালগাছের মাথায় তীর বিদ্ধ করিতে পারে, এমন সুদক্ষ তীরন্দাজ পাওয়া মুস্কিল। তখন কর্মচারী বলিল—যদি শক্ত সুতা দিয়া একটি ঘুড়ি উড়ান যায়, এবং চেষ্টা করিয়া উক্ত ঘুড়িকে গাছের মাথায় আটকান যায়, তাহা হইলে

সূতার দৈর্ঘ্য হইতে তালগাছের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। মন্ত্রী বলিলেন, তুমি ঘুড়ি গাছের মাথায় আটকাইতে পার? কর্মচারী বলিল, না হুজুর, কিন্তু যাহারা খুব ভাল ঘুড়ি উড়ায়, বোধ হয় তাহারা পারিবে। মন্ত্রী বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাউক, ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আছে কিনা। তিনি তখন একজন বড় বিশিষ্ট কর্মচারীকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন, আপনি কোন সহজ উপায়ে এই তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিতে পারেন কি?



ছায়া মাপিতে লাগিল

কর্মচারী বলিলেন, নিশ্চয়ই পারি, আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ কত উঁচু, তাহা মাপিয়া দিতেছি। তিনি তখন বাহিরে যাইয়া একটি প্রায় আট হাত লম্বা কাঠি সোজাভাবে (লম্বভাবে) মাটিতে পুতিলেন এবং একটি মাপকাঠি লইয়া কাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিলেন। দেখা গেল, ছায়া

দৈর্ঘ্য ছয় হাত এবং তখনই তালগাছের গোড়া হইতে সূতা ধরিয়া উহার ছায়া কত বড়, তাহা মাপিলেন। উহার দৈর্ঘ্য হইল ১২০ হাত। তখন তিনি হিসাব কষিলেন—ছয় হাত ছায়া যার, তার দৈর্ঘ্য যদি হয় আট হাত, তবে ১২০ হাত ছায়া যার তার দৈর্ঘ্য কত হইবে—৬ ঃ ৮ ঃঃ ১২০ ঃ ক, $\therefore$ ক $= \frac{১২০ \times ৯}{৬} =$ ১৬০ হাত। এই সমস্ত করিতে প্রায় পনের মিনিট সময় লাগিল। তখন তিনি আসিয়া বলিলেন, গাছের উচ্চতা ১৬০ হাত এবং যে প্রণালীতে উহা বাহির করিয়াছেন তাহাও সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। রাজা ও মন্ত্রী ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার তীক্ষ্নবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইল।*

তখন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রী, আপনি ইহা অপেক্ষা সহজে তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিয়া দিতে পারেন কি? মন্ত্রী বলিলেন, **Sextant** (কোণমান) যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষণিকের মধ্যেই গাছের বা যে কোন জিনিসের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। আমি এই যন্ত্রের কথা অবগত আছি কিন্তু ব্যবহারে অভ্যস্ত নই; আপনার জরীপ বিভাগের কর্মচারীরা অতি সহজেই এই কার্য করিতে পারে।

রাজা তখন জরীপ বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে ডাকাইলেন, এবং তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই Sextant দিয়া গাছের উচ্চতা ঠিক মাপিয়া বাহির করিলেন।

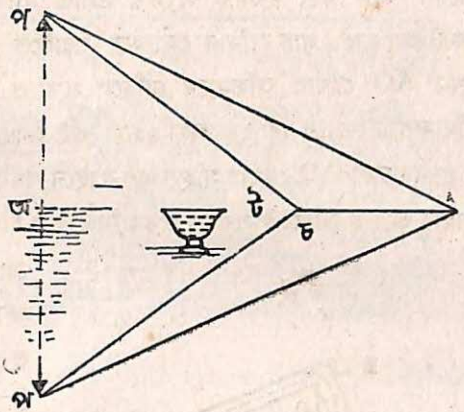
সেই দিন হইতে, রাজবাড়ীর ভৃত্যদের মধ্যে আর কাহারও কোন অসন্তোষের ভাব রহিল না। তাহারা নিজেদের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিল।

Sextant বা কোণমাপক যন্ত্র জরীপের কাজে ও সমুদ্রে সূর্য বা নক্ষত্রের অবস্থান নিরূপণ করিতে খুবই ব্যবহার হয়। এই যন্ত্র দ্বারা কি করিয়া দূরের জিনিসের উচ্চতা মাপা যায়; তাহা পর পৃষ্ঠার চিত্রে বোঝান যাইতেছে। মনে কর 'অপ' একটি উচ্চ গম্বুজ, এবং 'অপ' জলপাত্রে পতিত উহার ছায়া। দর্শক 'চ' বিন্দুতে আছে। তাহার সামনে একটি জলপূর্ণ পাত্র আছে,

---

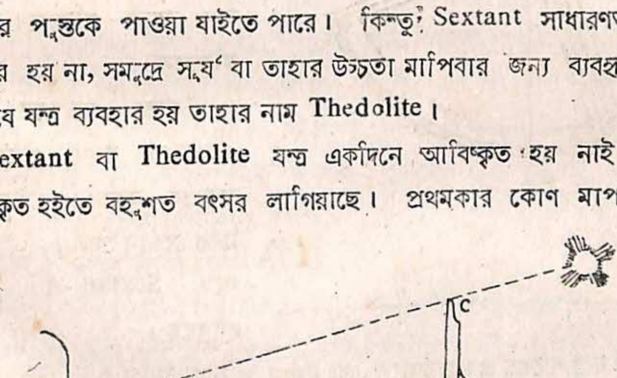
* কথিত আছে যে, একবার মিশরের এক রাজা তাঁহার সভার জ্ঞানী লোকদিগকে বিখ্যাত পিরামিডের উচ্চতা মাপিতে দেন। তখন গ্রীসের সপ্তজ্ঞানীর প্রধান জ্ঞানী মিলেটাস নগরবাসী থেলস্ (Thales of Miletus) এই উপায়ে পিরামিডের ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া উহার উচ্চতা নিরূপণ করেন।

তাহাতে সে গম্বুজের ছায়া দেখিতে পাইতেছে। 'চ' বিন্দুতে সে কোণমান যন্ত্র দিয়া 'পচপ'' কোণ এবং পরে খানিকদূর পশ্চাতে যাইয়া 'জ' বিন্দুতে দাঁড়াইয়া 'পজপ'' কোণ নিরূপণ করিল। এখন 'চজ'র দৈর্ঘ্য এবং ∠পচজ ও∠পজচ কোণ জানা আছে। সহজেই ত্রিকোণমিতির সাহায্যে 'অপ' রেখার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা যায়।



Sextant যন্ত্রের বর্ণনা যে কোন প্রাকৃতিক দর্শনের পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Sextant সাধারণতঃ স্থলে ব্যবহার হয় না, সমুদ্রে সূর্য বা তাহার উচ্চতা মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্থলে যে যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহার নাম **Thedolite**।

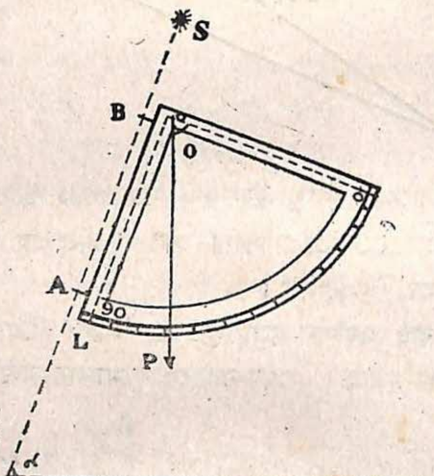
Sextant বা **Thedolite** যন্ত্র একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই। উহা আবিষ্কৃত হইতে বহুশত বৎসর লাগিয়াছে। প্রথমকার কোণ মাপার যন্ত্র



কোণমাপক (Balestilha) যন্ত্র—(আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত)

আরবদেশীয় পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেন। তাহার ছবি উপরে দেওয়া গেল। এ ছবি বুঝিতে বোধ হয় বিশেষ গোল হইবে না, কারণ ইহা ঠিক উপরের

চিত্রের প্রণালী অবলম্বনে নির্মিত। ক্ষিতিজ রেখাটি একটি কাষ্ঠ বা পিত্তল-নির্মিত দণ্ড এবং আর একটি দণ্ডকে লম্বভাবে উহার উপরে সরান যাইতে পারে। মনে কর, দ্রষ্টাকে সূর্যের উন্নতি মাপিতে হইবে। দ্রষ্টা সামনে একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া ক্রমান্বয়ে সরাইতে থাকে এবং দেখিতে থাকে কখন AG রেখার অভিমুখে চাহিলে সূর্য ও চক্ষু ঠিক এক লাইনে পড়ে। যদি যন্ত্র ঠিকভাবে ধরা হয় তাহা হইলে এই অবস্থানে সূর্যের জলমধ্যস্থ ছায়া ও দ্রষ্টার চক্ষু AD রেখার সহিত এক লাইনে থাকিবে। তখন কোণ মাপিয়া তাহার অর্ধেক করিলেই সূর্যের দূরত্ব নিরূপিত হইল। প্রথমে যখন পর্তুগাল দেশের নাবিকেরা আটলাণ্টিক মহাসাগরে নৌচালনা করেন তখন তাঁহারা সূর্য ও তারকার উচ্চতা মাপিবার জন্য এইরূপ যন্ত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন।



উচ্চতা মাপিতে আর একপ্রকার যন্ত্রও পর্তুগীজগণ ব্যবহার করেন। উহা এই চিত্রে দেখান গেল। এই যন্ত্রই পরে Sextant-এ পরিণত হইয়াছে।

এই যন্ত্র বৃত্তের এক চতুর্থাংশ এবং ইহার পরিধি ডিগ্রি ও মিনিটে বিভক্ত। দ্রষ্টা AB রেখাতে সূর্যের (S) দিকে দৃষ্টি করে। একটি ওলনদাঁড় OP লম্বভাবে ঝোলান দাঁড়। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে LOP কোণ সূর্যের উন্নতির সমান।

তিন

পশ্চিম ইউরোপের জাতিদের পৃথিবী পরিক্রমণের চেষ্টা



পরিক্রমণ কথার অর্থ বোধ হয় তোমরা জান না। পরিক্রমণ মানে চারিদিকে ঘুরিয়া আসা। পূর্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, প্রাচীনকালে পণ্ডিতগণ বহুদূর না যাইয়াও অঙ্ক কষিয়া বাহির করিয়াছিলেন, পৃথিবী অসীম নয় গোল। তাঁহারা মোটামুটি হিসাব করিয়া ঠিক করিয়া ছিলেন যে, পৃথিবীর পরিধি বা বেড় ২৫,০০০ মাইল। পৃথিবী যদি গোল হয়, তাহা হইলে উহার এক স্থান হইতে ক্রমাগত একদিকে চলিলে পুনরায় সেই স্থানেই আসিয়া পৌঁছান যায়। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত এরূপ কোন চেষ্টা কেহ করে নাই। কেন করে নাই, তাহা বোঝা তেমন শক্ত নয়।

প্রথমতঃ, পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে গোল ও সীমাবন্ধ মনে করিলেও সাধারণ লোকে সেই মত গ্রহণ করে নাই। কারণ পণ্ডিতেরা যাহা শীঘ্র বুঝিতে পারেন, সাধারণ লোকের তাহা বুঝিতে বহু বিলম্ব হয়। তাহারা পৃথিবীকে আদি অন্তহীন সমতল ক্ষেত্র বলিয়াই মানিত। নিজ নিজ দেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাহারা মনে করিত যে, যে সমস্ত দেশে তাহারা যায় নাই, তথায় নানারূপ রাক্ষস, যক্ষ এবং নরমাংস-ভোজী দৈত্য বাস করে। তোমরা এ সম্বন্ধে সংস্কৃত রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, যেখানে বানর-রাজা সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে বানর-সেনাকে চারিদিকে পাঠাইতেছেন, সেই কয়টি অধ্যায় পড়িয়া দেখিতে পার। আমরা এখানে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দেখিবে কি সব অদ্ভুত দেশের কথা ও প্রাণীর কথা ইহাতে আছে।

—সুগ্রীব বিনতনামা বানরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে কপিবর, তুমি, পূর্বদিকে যে সমস্ত পর্বত, দুর্গ, বন ও নদী আছে, সেই সেই স্থানে সীতার অন্বেষণ করিবে।

ভাগীরথী, সরযূ, কৌশকী, কালিন্দী, যমুনা ও যমুনা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাগিরি যামুন, সরস্বতী, সিন্ধু, শোণ, শৈল ও কাননসমূহে সুশোভিত শৈলময়ী প্রভৃতি এই সমস্ত নদী এবং ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র প্রভৃতি এই সকল দেশ ; কোষকার ভূমি অর্থাৎ কোষের তন্তুৎপাদক জন্তুদিগের উৎপত্তি-স্থান, রজতাকার অর্থাৎ রজতের খনি, এই সকল স্থানে রামের প্রিয় ভার্যা সীতাকে অন্বেষণ করিবে। পরে সমুদ্রের অন্তর্গত পর্বত, সমুদ্র দ্বীপ সমীপবর্তী নগর, মন্দর পর্বতের কটিস্থিত গ্রাম সকল এবং যাহাদের কর্ণপুর অতিশয় বিশাল ; যাহাদিগের কর্ণ ও ওষ্ঠ পর্যন্ত মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন ; যাহারা অতিশয় বেগবান্ একপাদ, অক্ষয় বলবান্ ও নরমাংসভোজী, যাহাদিগের কেশপাশ অতিশয় সূক্ষ্ম ; যাহারা স্বর্ণকান্তি ও সুন্দর দর্শন, যাহারা অপক্ক মৎস্যভোজী, জলচর ও ঘোর দর্শন, এই সমস্ত দ্বীপবাসী নরশ্রেষ্ঠ কিরাতদিগের আশ্রম এবং যে যে দেশে পর্বত লঙ্ঘনপূর্বক অথবা প্লবঙ্গ ও ভেলা দ্বারা গমন করা যায়, সেই সেই দেশ অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর তোমরা যত্নবান্ হইয়া সপ্তরাজ্যে পরিবেষ্টিত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার সমূহে সুশোভিত সুবর্ণদ্বীপ অন্বেষণ করিবে। ইক্ষু নামক মহাসমুদ্রের সমীপবর্তী সুপ্রশস্ত দ্বীপ অন্বেষণ করিয়া দেখিবে। সেই সমুদ্র সমীপে মহাকায় অসুর সকল বহুকাল বুভুক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মার বরপ্রভাবে নিরন্তর প্রাণিগণের ছায়া ভক্ষণ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে।

এইভাবে সুগ্রীব ঋষভ পর্বত, শিল নামক ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত অতি মহৎ এক পর্বত এবং যেখানে শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পদ্মপলাশ মহান্ বিশাললোচন ধরণীধর সর্প আছে, সে দেশের কথা বলিয়াছেন। সে সময় শ্রীমান্ উদয়াচলের কথা এবং একে একে সুবর্ণময় সৌমনস্ শৃঙ্গের বিষয় ও জম্বুদ্বীপের পরিচয় দিয়া সুগ্রীব বলিতেছেন, সূর্যের উদয়স্থান বা উদয়াচলের পূর্বদিকে গমন করিতে পারা যায় না। যেহেতু সেই পূর্বদিক্ দেবগণসমাবৃত, চন্দ্র-সূর্য বিরহিত ও অন্ধকারাবৃত। সুতরাং কেহই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে কপীন্দ্রগণ! আমি যে সমস্ত শৈল, গুহা, কানন ও নদীর কথা বলিলাম, আর যাহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা সেই সমস্ত স্থান

অন্বেষণ করিবে। পরন্তু যে স্থানে সূর্য প্রকাশিত না হন, সে স্থানে তোমরা গমন করিতে পারিবে না এবং তাহার পর আমারও বিদিত নাই। (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৪০ অধ্যায়)।

সুগ্রীব সুরম্বীপত্তন, জটায়ুর, অবন্তী, অঙ্গলেপ, আলক্ষিত নামক অরণ্যের কথা বলিয়াছেন, "যে স্থানে সিন্ধু ও সাগরের সঙ্গম হইয়াছে তথায় শত শৃঙ্গবিশিষ্ট বিশাল বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত সোম নামক মহাগিরি বিদ্যমান আছে। তাহার প্রান্তভাগে সিংহ নামক পক্ষীসকল বাস করে এবং তাহারা তিমি মৎস্য, হস্তী প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তু সকলকে কুলায়ে আনয়ন করিয়া থাকে। বাল্মীকি রামায়ণ—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড (৪০/৪১/৪২/৪৩ সর্গ)।

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, যে-কবি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তিনি কখনও বিদেশে যান নাই অথবা দেশের বাহিরের খবর তাঁহার মোটেই জানা ছিল না। শুধু কল্পনার আশ্রয় লইয়া তিনি রাক্ষস ও অসুরের অলীক কাহিনীতে পুস্তক পূর্ণ করিয়াছেন। এখন ইউরোপের কথা বলিতেছি।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভূমধ্যসাগরের চারিপার্শ্বস্থ গ্রীস, ফিনিশিয়া, ঈজিপ্ট (মিশর), কার্থেজ, রোম প্রভৃতি দেশের লোকে খুবই সভ্য হইয়াছিল। (১) গ্রীকদের প্রাচীন মহাকাব্য odysseyতে ইউলিসিস্ নামক এক প্রসিদ্ধ বীরের সমুদ্র-যাত্রা বর্ণিত আছে। তাহাতে একচক্ষু নরভুক রাক্ষস (Cyclop), মানুষকে মায়াতে জানোয়ার করিয়া রাখিতে পারে এরূপ অপদেবতা, এবং নানারূপ অদ্ভুত জানোয়ারের কথা লেখা আছে, যাহারা কোনকালে বাস্তবিক জগতে বর্তমান ছিল না। কিন্তু লোকে এই সমস্ত গল্পে বিশ্বাস করিত বলিয়া নেহাৎ দায়ে না পড়িলে কেহ বিদেশে যাইতে চাহিত না। খৃস্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পর্যন্ত এইরূপ ধারণা ইউরোপে বর্তমান ছিল। তখনকার লোকের পৃথিবী সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত ধারণা ছিল।

এই সময়ে ইউরোপের লোকের পশ্চিম সাগর (আটলাণ্টিক মহাসাগর) সম্বন্ধে আরও কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাহারা মনে করিত যে, সূর্য-দেবতা সারাদিন খাটুনির পর শ্রান্ত হইয়া রোজ সন্ধ্যাকালে পশ্চিম-সমুদ্রে ডুবেন; সুতরাং তাঁহার দেহের গরমে জল এত উত্তপ্ত হয় যে, সর্বদাই তাহা টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। সুতরাং সেই সমুদ্রে মানুষ-জন গেলে মোটেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আর এক মতে, পশ্চিম সাগরের সীমানায়

সর্বদা অন্ধকারময় কুয়াসা বর্তমান আছে, সেখানে দিগ্‌বিদিক দেখা যায় না এবং মানুষ সেখানে গেলে তাহার গায়ের রঙ্‌ নিগ্রোদের মত কালো হইয়া যায়।



সুতরাং ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে যাওয়ার জন্য লোকে মোটেই চেষ্টা করে নাই।

(২) কার্থেজদেশীয় হ্যানোর সমুদ্র-যাত্রা—খৃঃ পূর্ব ৫০০ অব্দ।

প্রাচীনকালের লোকে আটলাণ্টিক মহাসাগরে জলযাত্রা মোটেই করিত না, এই কথা বলা সম্পূর্ণ সত্য হইবে না। কারণ খৃস্টের জন্মের পাঁচশত বর্ষ পূর্বে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে কার্থেজ নামক নগর সভ্যতায় ও বাণিজ্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠে। কার্থেজবাসীরা প্রথমে ফিনিশিয়া দেশ হইতে আসিয়া উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যে খুব বিখ্যাত হইয়া উঠে। তাহারা পঞ্চাশ দাঁড়ওয়ালা নৌকা গঠন করিয়া পশ্চিম এশিয়া হইতে কাপড়, লাল রঙ্‌, কাঁচের দ্রব্যাদি লইয়া আধুনিক স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স, এমন কি আটলাণ্টিক মহাসাগর বাহিয়া আধুনিক ইংলণ্ডে পর্যন্ত যাইত। তখন পশ্চিম ইউরোপের লোক অসভ্য ছিল, তাহারা পশুর চর্ম পরিয়া থাকিত, এবং বোধ হয় তামা, পিতল বা লোহা ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহারও জানিত না।

ফিনিশিয় বণিকেরা কাপড়, কাঁচের জিনিস ইত্যাদি দিয়া ইংলণ্ড হইতে রাঙ্গ আনয়ন করিত এবং রাঙ্গের সহিত তামার মিশাল দিয়া পিতলের জিনিস তৈয়ার করিত। তৈয়ারী জিনিসের পূর্বদিকে খুব কাট্‌তি ছিল, সুতরাং ইহাতে

কার্থেজবাসীদের খুবই লাভ হইত। এইরূপ বহু দূরদেশে যাইতে যাইতে কার্থেজীয়দের সাহস খুব বাড়িয়া যায়। আনুমানিক পাঁচ শত পূর্ব খৃস্টাব্দে হ্যানো নামক বিখ্যাত নাবিক পঞ্চাশ দাঁড়ওয়ালা ষাটখানা নৌকা এবং তাহাতে প্রায় ৩০০০০ লোক, এবং বহুদিবসব্যাপী প্রবাসের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য লইয়া আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলভাগ জানিবার জন্য মহান্ চেষ্টা করেন। তাঁহারা আধুনিক জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার কূল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে যাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহারাই প্রথম আফ্রিকাতে অনেক অদ্ভুত জানোয়ার—যেমন গরিলা, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখিতে পান। অনুমান, তাঁহারা নাইজার নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কোন সভ্য লোক দেখিতে পান নাই।

জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই প্রণালীর দুই দিকে দুটি পাহাড়, মধ্যে সরু জল-প্রণালী। গ্রীসের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বে এই দুই পাহাড় যুক্ত ছিল এবং ভূমধ্যসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন যোগ ছিল না। পরে গ্রীক্ নরদেবতা হারকিউলিস্ একটি পাহাড় উপড়াইয়া ফেলিয়া দুই সমুদ্রের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া দেন। সেইজন্য এই প্রণালীর প্রাচীন নাম ছিল Pillars of Hercules। সপ্তম শতাব্দীতে তারিক্ নামক একজন আরবদেশীয় যোদ্ধা আফ্রিকা হইতে আসিয়া এই প্রণালী অতিক্রম করিয়া জিব্রাল্টার পর্বতের কাছে স্পেনের তৎকালীন রাজাকে পরাস্ত করেন। তাঁহার নামানুসারে পাহাড়ের নাম হয় জিবল্ তারিক অর্থাৎ তারিকের পাহাড়। উক্ত নাম হইতে বর্তমান নাম জিব্রাল্টার হইয়াছে।

মধ্যযুগ—খৃস্টের জন্মের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে রোমদেশের লোকেরা প্রায় একশত বৎসর যুদ্ধের পর কার্থেজ নগরের ধ্বংস সাধন করেন। তাহার পরে প্রায় দুই হাজার বৎসর ইউরোপের লোকেরা ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে যাওয়ার চেষ্টা করে নাই। রোমানরা যুদ্ধ লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত, তাহারা বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করা ভাল বুঝিত না। কিন্তু তখন পূর্ব দেশে চীন, ভারতবর্ষ ও আরবদেশের মধ্যে খুবই বাণিজ্য চলে। খৃস্টের জন্মের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের বিশেষতঃ কলিঙ্গ ও বাঙ্গলার লোকেরা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও, পূর্ব উপদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং এই সমস্ত দেশে খুব বড় বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নানাবিধ

ভারতীয় ধর্ম প্রচার করিয়া হিন্দু সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশ হইতে তাঁহারা ফিলিপাইন, চীন ও জাপান পর্যন্তও যাইতেন। চীনদেশ হইতেই বড় বড় নৌকা করিয়া বণিকেরা ভারতবর্ষ, পারস্য ও আরবদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন।

অনেকে মনে করেন, চীনদেশের লোকেরা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকা পর্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সমুদ্র-যাত্রা নানা কারণে ক্রমে স্থগিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষে খৃস্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে বৌদ্ধেরা নিস্তেজ হইয়া যান এবং খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলিলেন যে, যাহারা সমুদ্র-যাত্রা করিবে, তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করা হইবে। সুতরাং লোকে জাত হারাইবার ভয়ে আর বিদেশে যাইত না। তাহাদের স্থান পূর্ণ করে আরবদেশের লোকেরা। তাহারা চীনদের সহিত খুব বাণিজ্য চালাইতে লাগিল। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদ নাবিকের কথা পড়িয়াছ। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রা খুব কষ্টকর ব্যাপার। সমুদ্রে ঝড়-বাদলা আছে, নানা স্থানে নিমজ্জিত পর্বত আছে, যাহার উপর পড়িলে জাহাজ টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে পারে। তাহার পর মহাসমুদ্র অতিক্রম করিতে হইলে বহুদিনের খাবার সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সবচেয়ে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করাই কঠিন ব্যাপার। আমরা স্থলে দিক ঠিক করি দিনের বেলায় সূর্য দেখিয়া, এবং রাত্রে তারকা দেখিয়া। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে যখন সমস্ত তারকা লুপ্ত হইয়া যায়, তখন মহাসমুদ্রে লোকে কি করিয়া দিক ঠিক করিবে? তাহারা তখন হয়ত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া উত্তর দিক মনে করিয়া দক্ষিণ দিকে জাহাজ চালাইবে, এবং গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হইয়া মহাসমুদ্রে অজ্ঞাত স্থানে উপনীত হইবে। এইরূপে প্রাচীনকালে সমুদ্রগামী লোকদের অনেক বিপদ হইত, এবং অনেক লোকে সমুদ্রে প্রাণও হারাইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়াতে সমুদ্রযাত্রা কতকটা সহজসাধ্য হয়।

এতক্ষণ পূর্বদেশের জাতিরা পৃথিবীর কত অংশ আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা বলিলাম। যদিও ভারতবর্ষ ও আরবদেশে পৃথিবী গোল এই তথ্য পণ্ডিতদের মধ্যে জানা ছিল, তথাপি তাঁহারা কখনও সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। সে চেষ্টা প্রথম করে,—পশ্চিম ইউরোপের স্পেন ও পর্টুগালের লোকেরা, এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টার ফলেই সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তিত হয়। এখন সেই প্রচেষ্টার কথা বলিব।

ভারতবর্ষ, চীন ও আরবদেশ যখন খুব সভ্য ছিল, তখন ভূমধ্যসাগরের প্রান্তবর্তী দেশ ব্যতীত ইউরোপের অপরাপর দেশের লোকে বর্তমানকালের আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের মত অত্যন্ত অসভ্য ও বর্বর ছিল। তাহাদের না ছিল লেখাপড়ার জ্ঞান, না ছিল নিয়মবদ্ধ সমাজপ্রণালী বা কোনওরূপ নগর বা দুর্গ। খৃস্টের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব হইতে রোমনগরের লোকেরা প্রবল হইয়া উঠিয়া উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে, এবং বর্তমান ফ্রান্স, জার্মানির কতকাংশ, ব্রিটেন, স্পেন, পর্টুগাল প্রভৃতি



প্রাচীন পারস্যের নক্ষত্র-যন্ত্র

দেশ রোমানদের দখলে আসে। রোমানদের সংস্পর্শে আসিয়া এই সমস্ত দেশের লোক ক্রমশঃ সভ্য হইতে থাকে। খৃস্টের পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মানদেশীয় অসভ্য জাতিগণের আক্রমণে রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু এই চার পাঁচ শত বৎসরে এই সমস্ত দেশ রোমের ভাষা, লিপি ও সভ্যতা গ্রহণ করে। এখনও

ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল প্রভৃতি দেশের ভাষা ইতালী দেশে প্রাচীনকালে প্রচলিত লাটিন ভাষা হইতে উদ্ভূত। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও রোমের প্রভাব নষ্ট হয় নাই। কারণ, রোম নগর হইতে খৃস্টান ধর্মগুরু পোপের আদেশে খৃস্টান সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত দেশে যাইয়া খৃস্টধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে খৃস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশে বড় বড় রাজ্য, নগর, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি গড়িয়া উঠে। কিন্তু তখন আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। ৬৩০ খৃঃ অব্দ হইতে আরবদেশীয় লোকে মহম্মদ প্রচারিত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিবার জন্য উদ্যম করেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ৭১২ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের একজন সেনাপতি তারিক মাত্র ৩০০ সৈন্য লইয়া জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্পেনের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, এবং অচিরকাল মধ্যে সমস্ত স্পেন দেশ আরবদেশীয় মুসলমানদের দখলে আসে। খৃস্টানেরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্পেন পর্টুগালের উত্তর-পশ্চিম কোণে আশ্রয় লয়। মুসলমানেরা ফ্রান্স দেশও জয় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা **Poitiers** নগরের বিখ্যাত যুদ্ধে ফরাসী যুদ্ধ-নেতা **Karl the Hammerer** বা মুষলধারী কার্লের নিকট হারিয়া যান।

স্পেন দেশে মুসলমান রাজত্ব প্রায় ৭০০ বৎসর বর্তমান থাকে। তাঁহারা কার্ডোভা (Cardova), গ্রানাডা (Granada) প্রভৃতি সহরে বড় বড় দুর্গ, রাজ-প্রাসাদ ও বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। খৃস্টানেরা তাহাদিগকে মুর বলিত। এই মুরজাতীয় পন্ডিতেরা প্রাচ্যদেশের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন বা দ্রব্যতত্ত্ব ইত্যাদিতে খুব বিজ্ঞ ছিলেন এবং এখন আমরা যেমন বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিতে বিলাত যাই, তখন ইউরোপের লোকেরা এই সমস্ত বিদ্যা শিখিতে কর্ডোভা ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইত। ক্রমে এইরূপে ইউরোপের লোকেরা প্রাচীন গ্রীক, আরব ও হিন্দু পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত সমস্ত বিদ্যা জানিতে পারিল এবং পৃথিবীর বাস্তবিক আকার সম্বন্ধে তাহাদের ঠিক ধারণা হইল।

এই সময়ে পৃথিবীর শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা, প্রায় সমস্তই মুসলমানদের হস্তগত ছিল। ইউরোপে তখন চিনি, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র, মসলা ইত্যাদি অজ্ঞাত ছিল। তাহারা পরিত মাত্র পশমী বস্ত্র, এবং চিনি জানা ছিল না বলিয়া বনজাত মধু খাইত। রন্ধন করিতে কোন মসলা ব্যবহার করিত না, শুধু পোড়াইয়া, চর্বিতে ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া খাইত।

মুসলমান বণিক্‌গণ এই সমস্ত জিনিস স্থলপথে পারস্য, সিরিয়া, বর্তমান মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া আলেক্‌জাণ্ডিয়া, কনস্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ ইত্যাদি সহরে আনয়ন করিত, এবং এই সমস্ত বন্দর হইতে ইটালীর ভেনিস্‌-জেনোয়া এই দুই সহরের লোকেরা এবং মুসলমান বণিকেরা জাহাজে মাল বোঝাই করিয়া পশ্চিম ইউরোপে বিক্রয় করিতেন। এই বাণিজ্যের ফলে ভেনিস ও জেনোয়ার লোকেরা খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। ইহার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল – পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা খৃস্টান্‌ এবং তাঁহারা তীর্থ করিতে যীশুখৃস্টের জন্মস্থান জেরুজালেম নগরে যাইতেন। কিন্তু জেরুজালেম নগর ছিল মুসলমানদের দখলে, তাঁহারা প্রথম প্রথম খৃস্টানদিগকে অবাধে তীর্থ করিতে দিলেও ১২০০ সন হইতে তীর্থযাত্রীদের উপর খুব অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইউরোপের লোকেরা মুসলমানদের তাড়াইবার জন্য অনেকবার একত্র হইয়া যুদ্ধযাত্রা করে কিন্তু দুই তিন শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। এই সমস্ত যুদ্ধকে বলে Crusade বা ক্রুশের যুদ্ধ। পরন্তু ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে তুর্কীজাতীয় মুসলমানেরা কনস্টাণ্টি-নোপ্‌ল্‌ সহর দখল করিয়া পূর্ব ইউরোপ হইতে খৃস্টানদিগকে সম্পূর্ণ তাড়াইয়া দেয়। তখন ইউরোপের মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়।

এই মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে ইউরোপের খৃস্টান জগতের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয় স্পেন ও পর্টুগাল হইতে। পাঁচ শত বৎসরের সভ্যতার ফলে স্পেনের মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় অপটু হইয়া পড়ে, এবং স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে খৃস্টানেরা আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে দক্ষিণ দিকে হটাইতে থাকে। এইরূপে বর্তমান পর্টুগাল এবং স্পেন দেশে অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলমান বিজেতাগণকে আফ্রিকা দেশে হটাইয়া দিতে হইবে। এই চেষ্টায় একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পর্টুগালের রাজপুত্র নাবিক হেন্‌রী (Henry, the Navigator ১৩৯৪-১৪৬০)। কিন্তু তিনি সরাসরি মুরদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্যরূপে তাহাদিগকে ঘায়েল করিবার এক উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত উপায়কে এখন শুধু খেয়াল ছাড়া কিছু বলা যায় না, কিন্তু এই খেয়াল হইতেই পৃথিবীতে যুগান্তকারী ঘটনারাশির সূত্রপাত হইয়াছিল।

চার

পৃথিবী পরিক্রমণে পর্তুগীজ জাতির উদ্যম



নাবিক রাজকুমার হেন্‌রী

তোমরা সকলেই ভূগোলক (Globe) দেখিয়াছ। ভূগোলকের উপর পাঁচটি মহাদেশ আছে। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া। তন্মধ্যে সবচেয়ে ছোট হইতেছে ইউরোপ। কিন্তু ইউরোপ আকারে ছোট হইলে কি হয়। সভ্যতায়, পরাক্রমে ও শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চায় ইউরোপ সকল মহাদেশের অগ্রণী। ইউরোপের লোকেরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, ক্ষমতায় অন্যান্য দেশের লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রভুত্ব করিতেছে এবং অন্যান্য দেশের লোকে তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেশ হইতে লোকে শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য শিখিতে ইউরোপে যায়। ইউরোপ বর্তমান জগতের গুরু ও আদর্শস্থানীয়।

ইউরোপ মহাদেশ আবার নানা দেশে বিভক্ত। যেমন ইংলণ্ড, জার্মেনী, ফ্রান্স, রুশিয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত দেশের ভাষা এক নয় এবং সভ্যতাও এক নয়। অনেক দেশ খুবই সভ্য এবং সমৃদ্ধ, আবার অনেক দেশ খুব দরিদ্র এবং সভ্যতার খুব উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই। ইউরোপের মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে পশ্চিম ভাগে একটি উপদ্বীপ দেখিতে পাইবে। উহা দুইটি দেশে বিভক্ত—স্পেন ও পর্তুগাল। বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি নগণ্য ও দরিদ্র দেশ। এমন কি, ভারতবর্ষ অথবা চীন হইতে সভ্যতায় ও সমৃদ্ধিতে এই দুই দেশ বেশী শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু এক

সময় ছিল যখন স্পেন ও পর্তুগাল সাহিত্য, বিজ্ঞান, পরাক্রম ও সভ্যতায় ইউরোপে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়াই ইউরোপের অন্যান্য দেশ এত বড় হইয়াছে। স্পেন ও পর্তুগালের সেই গৌরবময় যুগের কথাই এখন বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে স্পেন-পর্তুগালে (সম্মিলিত দেশের নাম আইবিরীয় উপদ্বীপ) আইবিরীয় নামে এক জাতি বাস করিত। তাহারা তেমন সভ্য ছিল না। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল হইতে সুসভ্য ফিনিসীয় নাবিকেরা আসিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে এই উপদ্বীপের নানাস্থানে আইবিরীয় জাতীয় লোকদের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফিনিসীয়ানরা ছিল বড় সাহেব, আর আইবিরীয়গণ মুটে-মজুর হইয়া তাহাদের কারখানায় বা জাহাজে কাজ করিত। পরে এই সমস্ত উপনিবেশ প্রসিদ্ধ কার্থেজ নগরের দখলে আসে। কার্থেজীয়গণ স্পেন দেশে কেডিজ্, সেভিল প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর স্থাপন করেন। পরে খৃস্টের তিন শতাব্দী পূর্বের রোমানগণ কার্থেজীয়গণকে প্রায় শত বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া সমস্ত স্পেন দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। রোমান্ শাসন এই উপদ্বীপে এত বদ্ধমূল হয় যে, ক্রমে ক্রমে এই দেশের লোকেরা রোমানদের ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি গ্রহণ করে। এখনও পর্তুগাল ও স্পেনের ভাষা প্রাচীন রোমানদের ভাষা যাহাকে লাতিন ভাষা বলা হয়, তাহা হইতে উদ্ভূত। যেমন সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। খৃস্টের পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান্ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে, জার্মানজাতীয় লোকেরা স্পেন ও পর্তুগাল জয় করে, কিন্তু তাহারাও ক্রমে ক্রমে খৃস্টান ধর্ম ও রোমক সভ্যতা গ্রহণ করিয়া দেশের লোকের সহিত মিলিয়া যায়। এই রাজবংশ ৭১২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে, তৎপরে মুসলমান ধর্মাবলম্বী আরবেরা কি করিয়া সেনাপতি তারিকের (Tarik) অধীনে স্পেন দেশ জয় করে, তাহা পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।

মুসলমানেরা স্পেন দেশ কখনও সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পূর্ণ প্রভুত্বের সময় খৃস্টানেরা স্পেন ও পর্তুগালের উত্তর-পশ্চিম অংশে পলাইয়া পর্বত বহুল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সমস্ত গিরিদুর্গ হইতে মুসলমান সম্রাট্গণ কখনও খৃস্টানদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন নাই। অবশেষে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। মুসলমান বিজেতারা সহরে বাস করিয়া ক্রমে বিলাসী ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ হইলে পর্বতবাসী খৃস্টানেরা ক্রমে ক্রমে

তাঁহাদিগকে দক্ষিণদিকে হটাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এই উপদ্বীপে অনেক খৃস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মুরগণ শুধু রাজ্যের দক্ষিণভাগে 'গ্রানাডা' নগরকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে আবদ্ধ রহিল।

যখন পর্তুগালে বিদেশীয় মুরদিগকে তাড়াইবার জন্য এইরূপ স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছিল, তখন সেই দেশে এক দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের আবির্ভাব



নাবিক রাজকুমার হেন্‌রী

হয়। ইঁনি এই সময়ে না জন্মিলে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো-ডিগামার ভারতবর্ষে যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার ইত্যাদি বোধ হয় বহুদিন পিছাইয়া যাইত। ইঁনি পর্তুগালের রাজা প্রথম জনের তৃতীয় পুত্র হেন্‌রী। ইঁহার মাতা ছিলেন ইংলণ্ডের পরাক্রমী রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের পৌত্রী। হেন্‌রী বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত মেধাবী, তেজস্বী এবং বিদ্বান্‌ ছিলেন। অন্যান্য

খৃস্টান রাজপুত্রের মত তিনিও বাল্যকাল হইতে আশা পোষণ করিতেন যে মুসলমানদিগকে খৃস্টানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম হইতে তাড়াইয়া দিয়া তিনি খৃস্টান-জগতে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবেন।

কথিত আছে, হেন্‌রীর মাতা ইংরেজ রাজকুমারী ফিলিপার শিক্ষাতেই হেন্‌রী ও তাঁহার ভ্রাতারা শিক্ষায় ও বীরত্বে ইউরোপের রাজপুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তখন আফ্রিকার মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করা সমস্ত খৃস্টান রাজপুত্রই কর্তব্য ও গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। ফিলিপার তিন পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহারা আফ্রিকার যুদ্ধে যাইতে উৎসুক হইলেন। তাঁহাদিগের জন্য জাহাজও তৈয়ারী হইল। কিন্তু তখন রাণী ফিলিপা বিষম



প্রিয় পুত্রগণ! এই বায়ুই তোমাদিগকে কর্তব্যের পথে লইয়া যাইবে

পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। রাজপুত্রেরা মৃত্যুশয্যাশায়ী মাতাকে ফেলিয়া বিদেশে যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু রাণী ফিলিপা দমিবার পাত্রী ছিলেন না। তিনি পুত্রদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্বে তিনি হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসেন এবং চীৎকার করিয়া বলেন "কোন্ দিক হইতে এত প্রবল বাত্যা বহিতেছে?" অনুচরেরা বলিল, "উত্তর দিক হইতে।" তখন রাণী বলিলেন "প্রিয় পুত্রগণ! এই বায়ুই তোমাদিগকে কর্তব্যের পথে লইয়া যাইবে।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই

তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির্গত হইয়া গেল। মাতার মৃত্যুর পর হেন্‌রী ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আফ্রিকার সাগরকূলবর্তী কিউটা (Ceuta) বন্দর দখল করিলেন, কিন্তু এই সহর হইতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইয়া তাঁহারা মুরদের হস্তে পরাজিত হইলেন। হেন্‌রী দেখিলেন যে, স্থল-পথে আফ্রিকা মহাদেশের পর্বত ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মুরদিগকে পরাস্ত করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার, সুতরাং তিনি অপর কোনো উপায়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পর্তুগালের তদানীন্তন রাজা তাঁহাকে দক্ষিণ পর্তুগালের আলগার্ভস্‌ (Algarves) প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। সেই প্রদেশে সেণ্ট ভিনসেণ্ট অন্তরীপে সাগ্রেস্‌ নামক ক্ষুদ্র নগরে হেন্‌রী তাঁহার বাসস্থান ঠিক করিলেন। কিন্তু হেন্‌রী চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, স্থলপথে মুরদিগকে আক্রমণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার, কারণ অনেক বড় বড় রাজা এইরূপ প্রয়াস করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং এই জন্য অন্য উপায়ে মুরদিগকে আক্রমণ করিবার উপায়ের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। এই সময়ে মার্কোপোলোর পূর্বদেশের কথা প্রকাশিত হয়, এবং তাহা পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, মুসলমান জগতের পূর্বদেশেও এক বড় খৃস্টান রাজ্য আছে এবং সেই দেশে প্রেস্টার জন্‌ উপাধিধারী রাজকুল মহাপরাক্রমে রাজত্ব করেন। তিনি মনে করিলেন যে, যদি পূর্বদেশে যাওয়ার নূতন পথ আবিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত পূর্বদেশীয় খৃস্টান রাজার সহিত যোগদান করিয়া তিনি পশ্চাৎ দিক হইতে তুর্কীদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু পর্তুগাল হইতে পূর্বদেশে যাওয়ার তখন একমাত্র পথ ছিল, ভূমধ্যসাগরের ভিতর দিয়া, বা ইউরোপ বা আফ্রিকার ভিতর দিয়া। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে মুসলমানেরা প্রবল এবং আফ্রিকা মরুভূমিময়। সুতরাং পূর্বদেশে যাইতে হইলে আফ্রিকা ঘুরিয়া যাইতে হইবে, অথবা আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হইবে। কি করিয়া এ সমস্ত করা যাইতে পারে?

হেন্‌রী প্রাচীন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সমুদ্র অতিক্রম না করিলে পূর্বদেশে যাওয়ার নূতন পন্থা বাহির করা যাইবে না। তখন পর্তুগালে সাধারণ শ্রেণীর জেলে ব্যতীত ভাল নাবিক মোটেই ছিল না এবং লোকেরা সমুদ্রযাত্রার কিছু জানিত না। জেলেরা শুধু মাছ ধরিবার জন্য ছোট ছোট নৌকা করিয়া উপকূল হইতে দুই চার মাইল দূরে যাইত। কিন্তু

মুসলমানদের তখন বড় বড় জাহাজ সমস্ত ভুমধ্যসাগরে মাল লইয়া ফিরিত এবং তাহারা খৃস্টানদিগকে মোটেই আমল দিত না। খৃস্টানেরা সমুদ্রযাত্রা করিলে হয় মুসলমানেরা সেই সমস্ত জাহাজ ডুবাইয়া দিত, অথবা অন্য নানারূপ উৎপীড়ন করিত। শুধু জেনোয়া ও ভেনিসের লোকেরা তাহাদের সহিত সমান লড়াই করিতে পারিত কিন্তু তাহারাও অন্য খৃস্টান জাতিদিগকে আমল দিত না। কিন্তু হেন্‌রী হটিবার লোক ছিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, প্রথমতঃ তাঁহার দেশের লোকদিগকে জাহাজ তৈয়ারী এবং সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার কলকৌশল শিখাইতে হইবে। এইজন্য তিনি ১৪৩১ খৃঃ অব্দে রাজধানী লিসবন সহরে একটি নৌবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং ইটালী, সিসিলি, জার্মেনী প্রভৃতি দেশ হইতে দক্ষ নাবিক ও পণ্ডিত লোকদিগকে বহু বেতন দিয়া আনয়ন করিয়া দেশের লোকদিগকে নৌবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। পর্তুগালের ও স্পেনের বহু সম্ভ্রান্তবংশের ছেলেরা নূতন উৎসাহে মাতিয়া এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। ক্রমে যথেষ্ট লোক তৈয়ারী হইলে তিনি এক একটি নৌদল গঠন করিয়া তাহাদিগকে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ভাগ পর্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সাগ্রেস্ সহরে তাঁহার সভায় বহু সুদক্ষ নাবিক, জাহাজ-নির্মাতা এবং মানচিত্র তৈয়ারী করিতে সুদক্ষ লোক সমবেত হইল।

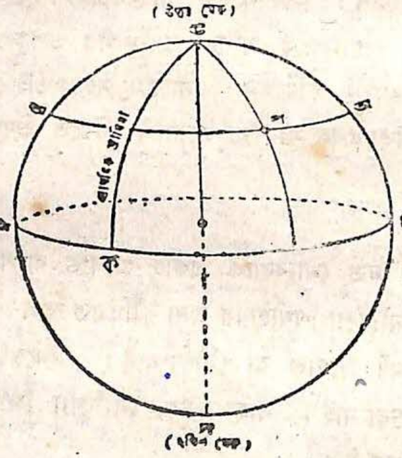
নৌবিদ্যা—

অন্যান্য বিদ্যার মত নৌবিদ্যাও একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার। বিলাতে ও অন্যান্য সভ্যদেশে নৌবিদ্যা শিখাইবার জন্য রীতিমত স্কুল ও কলেজ আছে। আমাদের বিদেশগামী জাহাজ বা নৌকা নাই। কাজেই, আমাদের মধ্যে নৌবিদ্যারও আলোচনা নাই। যাহা হউক, নৌবিদ্যা জিনিসটা কি, তাহার সামান্য পরিচয় এখানে দিব।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পার যে, মহাসমুদ্রে নৌকা বা জাহাজ চালান অতি দুরূহ ও বিপজ্জনক ব্যাপার। নির্বিঘ্নে নৌচালনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ভূগোল ভাল করিয়া জানা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, বৎসরের কোন্ সময় হাওয়া কোন্ দিক হইতে বহিবে, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা থাকা দরকার। তৃতীয়তঃ, মহাসমুদ্রে কোন্ স্থানে জাহাজ বর্তমান আছে, তাহার অবস্থান নির্ণয় করা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। এই বিষয় জানিতে হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্র (astronomy) খুব ভাল জানা দরকার।

কারণ, সমুদ্রে চারিদিকেই জল ; শুধু সূর্য বা তারকা দেখিয়াই নিজের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। প্রথমে যে সমস্ত জাতি সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে যাইত, তাহারা কতকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা আন্দাজের উপর জাহাজ চালাইত। প্রায় খৃস্টের পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশীয় নাবিকেরা প্রথম আবিষ্কার করেন যে, চুম্বক লোহাকে ঝুলাইয়া রাখিলে উহা উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান থাকে। তাঁহারা চুম্বক লোহা দিয়া সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রথমে আরবেরা, পরে ইউরোপীয়েরা দিক্ নির্ণয়ের জন্য চুম্বক লোহার ব্যবহার শিখে।

কিন্তু চুম্বক লোহাতে শুধু মোটামুটি উত্তর দিক ছাড়া আর কিছু জানা যায় না। পৃথিবীর ঠিক কোন্ অংশে জাহাজ আছে, তাহা জানিতে হইলে গোলকের ত্রিকোণমিতি জানা দরকার। মনে কর, চিত্রের গোলক দিয়া পৃথিবীকে



বোঝান যাইতেছে। 'উ' উত্তর মেরু, 'দ' দক্ষিণ মেরু এবং 'বি বি' বিষুব রেখা। 'প' কোনও স্থানের অবস্থান। এই অবস্থান বাহির করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে, উহা বিষুবনের কতটা উত্তরে বা দক্ষিণে। 'উ' হইতে 'উপ' এই রেখা গোলকের উপর টানিলে উহা বিষুবনকে 'গ' বিন্দুতে ছেদ করিবে। এখন 'পগ' কোণকে 'অক্ষাংশ' বলে। 'প' যদি বিষুবনের উপর হয়, তাহা হইলে অক্ষাংশ শূন্য, যদি 'উ' বা উত্তর মেরুর সহিত মিলিয়া যায়

তাহা হইলে অক্ষাংশ ৯০ ডিগ্রী। যতই উত্তরে যাওয়া যায় অক্ষাংশ ততই বাড়িতে থাকে। "পৃথিবীর আকার ও অবস্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে বোঝান হইয়াছে যে, কি করিয়া 'ধ্রুবতারার উন্নতি' হইতে অক্ষাংশ নিরূপণ করা যায়।

কিন্তু শুধু অক্ষাংশ জানিলেই অক্ষাংশ নিরূপণ হয় না। কারণ 'প'র ভিতর দিয়া যদি বিষুবনের সমান্তরাল ভাবে 'অঅ' এই বৃত্তাকার রেখা টানা যায়, তাহা হইলে উহার সকল বিন্দুই বিষুবন হইতে সমান দূরে থাকে। সুতরাং 'প' বিন্দুকে জানার জন্য উহা কতটা পূর্বে বা পশ্চিমে আছে জানা দরকার। এই জন্য বিষুবনের উপর একটি আদি বিন্দু 'ক' কল্পিত হয় এবং 'উক' এই বৃত্তাকার রেখা টানা হয়। 'উক' প্রাথমিক রেখাকে দ্রাঘিমা রেখা বলা হয়। এখন 'কগ' রেখা মাপিলেই 'প' বিন্দু 'ক' হইতে কতটা পূর্বে বা পশ্চিমে তাহা জানা যায়। 'উ' বিন্দু একটা নির্দিষ্ট বিন্দু (উত্তর মেরু) কিন্তু 'ক' সম্পূর্ণ কল্পিত। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকেরা নিজেদের সুবিধামত প্রাথমিক দ্রাঘিমা কল্পনা করিয়াছে। যেমন হিন্দুদের প্রাথমিক দ্রাঘিমা ছিল লঙ্কার ভিতর দিয়া, আরবদের বাগদাদের ভিতর দিয়া, ইংরেজদের গ্রীনউইচের ভিতর দিয়া, এবং অপরাপর ইউরোপীয় জাতির ফেরো দ্বীপের মধ্য দিয়া।

এখন সমুদ্রে কি করিয়া দ্রাঘিমা নিরূপণ করা যায়? তোমরা বোধ হয় জান যে, পৃথিবীর সমস্ত স্থানে এক সময়ে সূর্যোদয় হয় না। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর আবর্তনের জন্য দিনরাত্রি হইতেছে। সেইজন্য পূর্বদিকে যখন কোনস্থানে প্রথম সূর্য উঠে, তখন উহার পশ্চিমদিকে সমস্ত স্থানে রাত্রি ও পূর্বদিকে সমস্ত স্থানে দিন থাকে। ক্রমে পৃথিবী যেমন ঘুরিয়া আসিতে থাকে, তেমনি ক্রমান্বয়ে পশ্চিমদিকে সূর্য উঠিতে থাকে, এবং পূর্বদিকে রাত্রি হইতে থাকে। এখন প্রত্যেক স্থানেই মধ্যরাত্রি হইতে দিনের আরম্ভ গণনা করা হয়। সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র এক সময়ে দিন আরম্ভ হয় না। জাপানে যখন শেষ রাত্রি ৪টা, কলিকাতায় তখন মধ্যরাত্রি, এবং লন্ডনে তখন দিন আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় কিরূপ তফাৎ তাহা ইহাতে বোঝান গেল।

আধুনিক কালে নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রা করিতে হইলে গ্রীনউইচের ঘড়ির সঙ্গে মেলান একটি বা দুইটি খুব ভাল ঘড়ি সঙ্গে রাখেন। সঙ্গে আর একটি সমতুল্য ঘড়ি থাকে। দ্বিতীয় ঘড়ির কাঁটাকে প্রতিদিন মধ্যরাত্রে ঠিক শূন্য অঙ্কে রাখিয়া দেওয়া হয়। অথবা মধ্যাহ্নে ঠিক ১২টায় রাখা হয়।

মধ্যাহ্ন পর্যবেক্ষণ করা খুবই সোজা, কারণ তখন সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকে। সূর্য দেখা অসম্ভব হইলে কোন চিহ্নিত তারকা পর্যবেক্ষণ করিলেও চলে। দুই ঘড়ির সময়ের তফাৎ হইতে অনায়াসে দ্রাঘিমা নিরূপণ করা যায়।

জাহাজ ঠিক মত চালাইতে হইলে প্রত্যেক নাবিকের ঘরে নিম্নলিখিত যন্ত্রাদি চাই।

তারকার উন্নতি মানিবার জন্য ....Sextant বা (কোণমাপক যন্ত্র)

দ্রাঘিমা মাপার জন্য (Chronometer) খুব ভাল ঘড়ি

তারকা বা সূর্য যখন আকাশের মধ্যরেখা অতিক্রম করে তাহা পর্যবেক্ষণ করার জন্য } (Transit Instrument) (সংক্রমণ দর্শক)

দূরস্থ জিনিস পর্যবেক্ষণের জন্য·········Telescope (দূরবীক্ষণ)

দিক্ নির্ণয়ের জন্য·········Mariner's Compass (সামুদ্রিক দিক নির্ণয় যন্ত্র)

তাপ মাপার জন্য·········Thermometer বা (তাপমান যন্ত্র)

বায়ুর চাপ মাপার জন্য ······Barometer বা (চাপমান যন্ত্র)

বাতাসের গতি মাপার জন্য ······Anemometer (বায়ুগতিমাপক যন্ত্র)

দূরে সংবাদ প্রেরণের জন্য·········বেতার বার্তাবহ যন্ত্র।

কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন অধিকাংশ যন্ত্র শুধু কল্পনার বিষয় ছিল। তখন সূর্যের উন্নতি মাপা হইত Astrolabe যন্ত্র দিয়া। সময় ঠিক করার জন্য আজকাল যেরূপ নানাবিধ ঘড়ির ব্যবহার হয়, সেরূপ ঘড়ি তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহারা Hour-glass দিয়া সময় নিরূপণ করিত। অন্যান্য যন্ত্র ত আরও আধুনিক।

তখন জাহাজগুলি ছিল খুব বড় বড় নৌকার উন্নত সংস্করণ। তাহারা বাষ্পের জোরে চলিত না—চলিত দাঁড় বা বাতাসের জোরে।

যাহা হউক, হেনরীর চেষ্টায় অতি শীঘ্রই পর্তুগাল দেশে এক সুদক্ষ নাবিকদলের সৃষ্টি হইল এবং ভাল ভাল জাহাজ তৈয়ারী হইল। তিনি তখন এক একটি নৌবহর গঠন করিয়া এক এক জন দক্ষ নাবিকের অধীনে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে প্রেরণ করিতেন। একদল ফিরিয়া আসিলে তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতা সমস্ত লিখিয়া রাখা হইত এবং অন্য দল পুনরায় প্রেরিত হইত।

জার্কো (Zarco) নামক নাবিক প্রথমে মেডেরিয়া দ্বীপ আবিষ্কার করেন। যখন এই দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়, তখন ইহা জঙ্গলময় ছিল এবং সেখানে লোকজনের বসতি ছিল না। মানুষের আবাসযোগ্য করার জন্য জার্কো এই দ্বীপে আগুন ধরাইয়া দেন। সাত বৎসর পর্যন্ত এই দ্বীপ জ্বলিতে থাকে এবং হেনরীর নাবিকেরা যখন দক্ষিণ দিকে যাইতেন, তখন এই দ্বীপ তাঁহাদের আলোকস্তম্ভের কাজ করিত। সাত বৎসরে সমস্ত দ্বীপ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে, জমি পরিষ্কার করিয়া লোক বসান হয় এবং দ্রাক্ষা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষবাস আরম্ভ হয়। এখন মেডেরিয়া দ্বীপ হইতে ইউরোপে প্রচুর ফল রপ্তানি হয়।

১৪৩৪ Gil Eannes—বহুদিন পর্যন্ত পর্তুগীজরা Bojador অন্তরীপের দক্ষিণে যাইতে পারে নাই, কারণ পথ হারাইবার ভয়ে তাহারা শুধু উপকূল ধরিয়া ধরিয়া যাইত। এই স্থানের সমুদ্রোপকূল চড়ায় পূর্ণ ছিল। এই চড়াতে জাহাজ প্রায়ই আটকাইয়া যাইত। অবশেষে Gil Eannes নামক একজন সাহসী নাবিক উপকূল কিছু দূরে রাখিয়া খোলা সমুদ্রে জাহাজ চালান। তিনি দেখিলেন যে, কিছুদূর গেলেই আর চড়ার ভয় থাকে না, এবং সমুদ্রে বেশ স্বচ্ছন্দে জাহাজ চালান যায়। এইরূপে পর্তুগীজদের বহিঃসমুদ্রে নৌচালনার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল।

১৪৪১ Nuno Tristram—এই নাবিক প্রথমবারে Blanco অন্তরীপ, দ্বিতীয়বারে (১৪৪৫) Verd অন্তরীপ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই স্থানে নিগ্রোদের সহিত যুদ্ধে জাহাজের প্রায় সমস্ত লোকই নিহত হয়, এবং সাতজন লোক কোন মতে পলায়ন করিয়া পর্তুগালে ফিরিয়া আসেন।

১৪৪৫ Cadamosto—Cadamosto নামক ভেনিস্ দেশীয় নাবিক হেনরীর অনুমতি লইয়া গাম্বিয়া নদীর মুখ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং এখানকার নিগ্রোদের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

Cadamosto দেখেন যে, এইস্থানে 'ধ্রুবতারা' ক্ষিতিজতল হইতে মাত্র এক বর্শা (Lance) উপরে অবস্থিত। তিনি দক্ষিণ দিকে নানারূপ নূতন তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তন্মধ্যে ছয়টি উজ্জ্বল তারা ক্রুশের আকারে বিন্যস্ত, এই বৃত্তান্ত পাঠে পর্তুগীজদের সাহস বাড়িয়া যায়। তাহারা মনে করেন যে, যীশুখৃস্ট স্বয়ং তাঁহাদের সুবিধার জন্য দক্ষিণ দিকে ক্রুশাকারে বিন্যস্ত তারকা-

পুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৪৬০ খৃঃ অব্দে হেন্‌রীর মৃত্যু হয়। পর্তুগালের ইতিহাসে ইহার চেয়ে বড়লোকের জন্ম হয় নাই।

Pedrode Cintra—হেন্‌রীর মৃত্যুর বৎসরেই এই নাবিক পূর্বের সীমা হইতে আরও ছয় শত মাইল অগ্রসর হন। এ পর্যন্ত পর্তুগীজগণ শুধু দক্ষিণেই যাইতেছিলেন। এইবার তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, উপকূলভাগ পূর্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সাহস হইল যে, ক্রমে তাঁহারা পূর্বদিকে যাইতে যাইতে ভারতবর্ষে পেঁাছিতে পারিবেন।

১৪৭১···Fernando Po—কিন্তু ১৪৭১ খৃঃ অব্দে এই নাবিক আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলরেখা আবার দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাতে পুনরায় পর্তুগীজদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ঠিক বিষুবরেখায় পেঁাছেন। অতঃপর আর 'ধ্রুবতারা' দৃষ্টিগোচর হইল না।

পাঁচ

পৃথিবী পরিক্রমণে স্পেনের প্রচেষ্টা—ম্যাগেলানের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমণ



পূর্ব দুই প্রবন্ধে আমরা পৃথিবী পরিক্রমণে পর্তুগালের প্রচেষ্টার কথাই বলিয়াছি। এইবার পর্তুগালের প্রতিবেশী স্পেনের প্রচেষ্টার কথা বলিব। স্পেন ও পর্তুগাল পাশাপাশি দেশ এবং উভয়ের ধর্ম ও ভাষা প্রায় এক। তথাপি দুই দেশের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়েই খুব রেষারেষি চলিত। সামুদ্রিক অভিযানে স্পেন বহুকাল পর্যন্ত বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কারণ, বর্তমান স্পেনের অধিকাংশ প্রদেশই তখন মুসলমান-ধর্মাবলম্বী মুরদের অধীন ছিল। কেবলমাত্র স্পেনের উত্তর-পশ্চিম কোণে পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশের খৃস্টানগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুরগণ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং খৃস্টান রাজগণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দক্ষিণে হটাইয়া দেন। অবশেষে ১৪৮০ খৃস্টাব্দে ক্যাস্টিল নামক এক প্রদেশের রাজকন্যা ইসাবেলা (Isabella) এবং আরাগন নামক আর এক প্রদেশের রাজপুত্র ফার্ডিনান্ড পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র স্পেনদেশকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে মুরদের শেষ রাজা বোয়াব্দিল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্পেনদেশ পরিত্যাগ করেন এবং সমস্ত স্পেনে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধবিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্পেনও পর্তুগালের মত বিদেশে রাজ্যবিস্তার করিতে আগ্রহান্বিত হইল। কিন্তু স্পেনদেশে পর্তুগালের মত

সুদক্ষ নাবিক ছিল না। তাহারা পর্তুগালের নাবিকদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের কার্যে নিযুক্ত করিত।

এই সময় ক্রিস্টোফার্ কলম্বস নামক জনৈক জেনোয়াদেশী নাবিক রাণী ইসাবেলার নিকট প্রস্তাব করেন যে, উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য পাইলে তিনি ক্রমাগত পশ্চিমদিকে যাইয়াও ভারতবর্ষে যাইবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে পারিবেন। কলম্বস্ কিরূপে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে যাইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন, সে বৃত্তান্ত পূর্বেই তোমরা জানিতে পারিয়াছ।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, স্পেন কেন পূর্বদিকে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারে বাহির হয় নাই। স্পেন যখন ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হয়, তখন তাহার সহিত পর্তুগালের এক সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম ঘটে। কারণ, তখন পূর্বদিকের কয়েকটি দেশে—বিশেষতঃ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ভাগে—পর্তুগীজদের আধিপত্য বেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই, স্পেনদেশীয় নাবিকগণ পূর্বদিকে যাতায়াত করিলে তাহাদের একচেটিয়া স্বার্থে আঘাত লাগিবে, এই আশংকায় তাহারা স্পেনের এই নূতন অভিযানে যথাসম্ভব বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহাতে এই দুই খৃস্টান শক্তির মধ্যে আত্মকলহ না ঘটে, তজ্জন্য খৃস্টান্ জগতের ধর্মগুরু পোপ্ ১৪৯৫ খৃস্টাব্দে এক আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ ফেরো-দ্বীপের পূর্বাংশে শুধু পর্তুগালের জাহাজ যাইতে পারিবে এবং পশ্চিমদিকে শুধু স্পেনের জাহাজ যাইতে পারিবে। পূর্বদিকে যে-সমস্ত দেশ আবিষ্কৃত হইবে, তাহা থাকিবে পর্তুগালের দখলে এবং পশ্চিমদিকের দেশগুলি থাকিবে স্পেনের অধিকারে। এইভাবে ধর্মগুরু পোপ্ দুই দেশের বিবাদের সুমীমাংসা করিয়া দেন।

কাজেই, স্পেনের পক্ষে পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রা করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কলম্বস যখন আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় উপনীত হন, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ভারতবর্ষের পূর্বদিকস্থ জাপান দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, উহা এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ। কলম্বসের এই আবিষ্কারে পর্তুগীজরা ভাবিল যে, বাস্তবিকই যদি স্পেনিয়ার্ডগণ পশ্চিম দিকে যাইয়া ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইবে। সেইজন্য তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পূর্বদিক দিয়া ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিতে যত্নবান হয়।

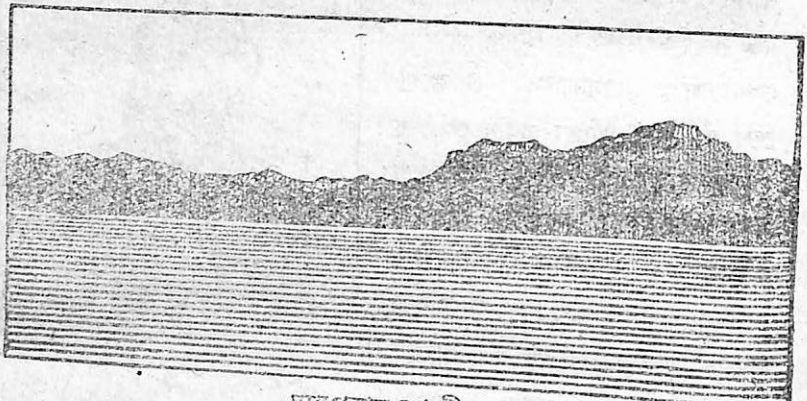
অবশেষে ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে ভাস্কোডাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ভাস্কোডাগামার আবিষ্কারের কথা পরে বলা যাইবে।

ভাস্কোডাগামার আবিষ্কারের সংবাদ শুনিয়া স্পেনের রাজা খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। কারণ, তাঁহার ভাগ্যে ভারতবর্ষের বাণিজ্য মিলিল না। কিন্তু তবুও তিনি দমিলেন না। তিনি পরপর কলম্বসের অধীনে আরও তিনবার পশ্চিম-দিকে জাহাজের বহর পাঠান এবং এই সমস্ত জাহাজের কাপ্তেনগণ ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের বহু স্থান আবিষ্কার করেন। এই সময়ে আমেরিকায় দুই সুসভ্য সাম্রাজ্য ছিল। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশে আজটেক (Aztec) নামক এক পরাক্রান্ত জাতি শাসন করিত। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে 'ইঙ্কা' উপাধিধারী রাজবংশ এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করিত। ১৫১৯ খৃস্টাব্দে কর্টেস (Cortes) নামক একজন স্পেনদেশীয় ভাগ্যান্বেষী মেক্সিকো দেশ অধিকার করিয়া তথায় স্পেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ স্পেনের হস্তগত হইল। (শুধু বর্তমান ব্রেজিল দেশ ব্যতীত)। আমেরিকা নামের একটু ইতিহাস আছে। কলম্বস্ যখন তৃতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহিত আমেরিগো ভেস্পুসি (Amerigo Vesspussi) নামক একজন ফ্লোরেন্সদেশীয় ঠিকাদার (Contractor) ছিল। এই লোকটি দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র উপকূল পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেন, এবং সেই পুস্তকে তিনি সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে, কলম্বস্ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেন নাই—সম্পূর্ণ এক নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নামানুসারে এই মহাদেশের নাম রাখা হয় আমেরিকা। কলম্বস্ ইহার অধিবাসিগণকে ভুলক্রমে 'ইন্ডিয়ান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্তও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে রেড্ ইণ্ডিয়ান



ম্যাগেলান

(Red Indian) বলা হয়। কারণ, তাহাদের গায়ের বর্ণ তাম্রের মত লাল আভাযুক্ত। ১৫১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা দেশ দক্ষিণে কতদূর প্রসারিত, তৎসম্বন্ধে স্পেনিয়ার্ডদের কোন ধারণা ছিল না। এই সময় বালবোয়া (Balboa) নামক একজন স্পেনদেশীয় ভাগ্যান্বেষী পানামা যোজক আবিষ্কার করেন। সে স্থানের আদিম অধিবাসিগণ বালবোয়াকে বলে যে, যোজকের পশ্চিমদিকে অন্য এক মহাসাগর বর্তমান আছে। বালবোয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক প্রকান্ড বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া সেই মহাসাগর দেখিতে পান। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই মহাসাগরের তীরে পৌঁছেন। বালবোয়ার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এক বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ করিয়া এই নূতন মহাসাগর পরিক্রমণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। কারণ, তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা তাঁহার বিবিধ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে স্পেনের সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস্, ফার্নাণ্ডেজ্



ম্যাগেলান প্রণালী

ম্যাগেলান (Fernandez Magellan) নামক এক পর্তুগীজ্ নাবিককে পুনরার পশ্চিমদিক্ দিয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করেন। ম্যাগেলানের দলই সর্বপ্রথম পৃথিবী পরিক্রমণে সমর্থ হন।

ফার্নাণ্ডেজ ম্যাগেলান পর্তুগাল দেশীয় লোক। পর্তুগালের এক সম্ভ্রান্ত বংশে আনুমানিক ১৪৮০ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও নৌবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং যৌবনে পর্তুগীজ নাবিকদের সহিত বহুবার সমুদ্রে যাতায়াত করেন। এই উপলক্ষে তিনি ভারতবর্ষ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পর্তুগালের রাজা

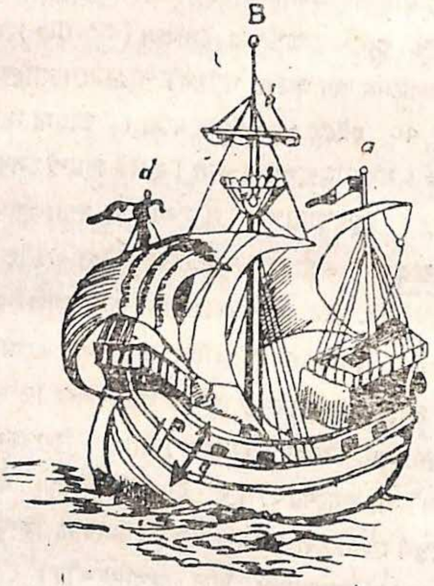
ম্যানুয়েল তাঁহার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া স্পেনের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত রাজার এই মর্মে চুক্তি হয় যে, রাজা তাহাকে খাদ্য ও বিবিধ সরঞ্জাম সহ পাঁচখানা জাহাজ দিবেন এবং ম্যাগেলান যে সমস্ত দেশ আবিষ্কার করিবেন, তাহা স্পেনের রাজার সম্পত্তি হইবে। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে দুইখানা দ্বীপ নিজের জন্য রাখিতে পারিবেন। এই সমুদ্রযাত্রায় যাহা লাভ হইবে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ ম্যাগেলান্ পাইবেন।

১৫১৯ খৃঃ অব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর সেভিল (Seville) বন্দর হইতে পাঁচখানি জাহাজ ম্যাগেলানের অধ্যক্ষতায় পৃথিবী পরিক্রমণে বাহির হইল। ইহাদের মালবহনের ক্ষমতা ৭৫ হইতে ১২০ টনের মধ্যে। তাহার সঙ্গে ৮২ টা বন্দুক, ১৮টি Hour-glass (সময় নিরূপণের জন্য) ২৫টি য়্যাস্ট্রোলেব (Astrolabe—সূর্য অথবা নক্ষত্রের উচ্চতামাপক পূর্বকালীন যন্ত্রবিশেষ) এবং সূর্য ও তারকা নিরূপণ করার জন্য একপ্রকার যন্ত্র ছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহারা লইলেন, ৬০টি ধনুক, ৩৬০টি তীর, ১টন বারুদ এবং নানা রকম লোহা ও কাচের জিনিস। আণ্টনিও পিগাফেটা (Antonio Pigafetta) নামক একজন ইটালীদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এই সমুদ্র-অভিযানে যোগদান করেন এবং তিনি তাঁহাদের সমুদ্রযাত্রার সম্পূর্ণ দৈনন্দিন বিবরণ (Diary) রাখিয়া গিয়াছেন। এই ডায়েরী হইতে প্রথম পৃথিবী পরিক্রমণের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। পিগাফেটা লিখিয়াছেন, 'কাপ্তেন জেনারেল নিজে পর্তুগীজ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অন্য চারি জাহাজের কাপ্তেনেরা ছিল স্পেনদেশীয়। কাজেই, তাঁহারা ম্যাগেলানকে মোটেই মানিতে চাহিতেন না। ম্যাগেলান প্রথমে অন্য কাপ্তেনদিগকে তাঁহার প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুই খুলিয়া বলেন নাই।

আমরা সর্বশুদ্ধ ২৩৪ জন লোক পাঁচখানা জাহাজে রওনা হইলাম। প্রথমে আমরা ক্যানারী দ্বীপে পৌঁছিয়া কয়েকদিন শুধু জল ও কাষ্ঠ আহরণ করিলাম।

৩রা অক্টোবর আমরা ক্রমাগত দক্ষিণে চলিতে লাগিলাম। আমরা ভার্ড (Verd) অন্তরীপ বামে রাখিয়া সমুদ্রের উপকূল দিয়া ক্রমে ৮° ডিগ্রি অক্ষাংশ অতিক্রম করিলাম। এই স্থান হইতে সিয়ারা লিয়োন (Sierra leon)-এর পর্বত দৃষ্টিগোচর হইল। এই স্থান হইতে বাতাস প্রতিকূল বহিতে লাগিল এবং সময় সময় বৃষ্টি ও ভীষণ গুমটের ভিতর দিয়া আমরা দক্ষিণে বিষুবন রেখা পর্যন্ত অগ্রসর হইলাম।

বিষুবন রেখা অতিক্রম করার পর ধ্রুবতারা আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল। আমরা তখন ব্রেজিলের দিকে লক্ষ্য করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া অগ্রসর হইলাম। ১৩ই ডিসেম্বর আমরা ব্রেজিলের রাজধানী রাইও-ডি-জেনিরো (**Rio-de-Janerio**) বন্দরে পেঁাছিলাম। এই বন্দরে ১৩ দিন কাটাইয়া আমরা উপকূল ভাগ দিয়া অগ্রসর হইলাম। ৩৪° দক্ষিণ অক্ষাংশে পেঁাছিলে



ম্যাগেলানের ভিক্টোরিয়া জাহাজ

আমরা একটি বড় নদীর (La Plata) মোহনায় পেঁাছিলাম। আমরা প্রথম মনে করিয়াছিলাম যে, ইহা পশ্চিম সমুদ্রে যাওয়ার প্রণালী, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া দক্ষিণে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে মে মাসে ৪৯° ডিগ্রী অক্ষাংশে উপস্থিত হইলে আমরা একটি ভাল পোতাশ্রয় দেখিতে পাইলাম। এই সময়ে শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে আমরা এইখানেই সমস্ত শীত ঋতু প্রবাস করিতে মনঃস্থ করিলাম। এই বন্দরে আমরা পাঁচমাস কাটাইলাম, কিন্তু জাহাজের নাবিকদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। অন্য চারিজন কাপ্তেন স্পেনদেশীয়। ম্যাগেলানের কর্তৃত্ব তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহারা বিদ্রোহ করিয়া ম্যাগেলান্‌কে নিহত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কাপ্তেন জেনারেল পূর্বেই খবর পাইয়া খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। বন্দীদের দুইজনকে বন্দুকের গুলিতে মারিয়া ফেলা হইল এবং আর দুইজনকে সমুদ্রোপকূলে রাখিয়া যাওয়া হইল। এই দেশের (Patagonia) লোকেরা মহাকায় (৬½ ফিট উঁচু) এবং নরমাংসভোজী। এই সময়ে সান্তিয়াগো (Santiago) জাহাজ চড়ায় আট্‌কাইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

সেণ্ট জুলিয়ান হইতে বহির্গত হইয়া ২১ শে অক্টোবর আমরা নূতন এক জলপ্রণালীতে পেঁাছিলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে, এই স্থানেই নূতন মহাদেশের শেষ, এই প্রণালী দিয়া পশ্চিম মহাসাগরে যাওয়া যায়।

এই জলপ্রণালীর বর্তমান নাম ম্যাগেলান প্রণালী (Straits of Magellan)। কিন্তু ম্যাগেলান ইহার নাম দেন (Strait of Eleven Thousand Virgins.)। এই প্রণালী আবিষ্কারের পর ম্যাগেলানের মনে আশার সঞ্চার হইল যে, হয়ত পশ্চিম সমুদ্রে যাওয়ার পথ মিলিল। কিন্তু এই প্রণালীর উভয় পার্শ্বে বরফে ঢাকা উঁচু উঁচু পর্বত ছিল এবং কোথায়ও নঙ্গর করিবার স্থান ছিল না। এই স্থানে রাত্রে প্রবল ঝড়ে নাবিকদের ভীষণ কষ্ট হয়। দুইখানা জাহাজ ঝড়ের বেগে এই প্রণালীর ভিতর বহুদূর পর্যন্ত চালিত হয় এবং কিছুদূরে তাঁহারা আর একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী দেখিতে পান। এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মনে হইল যে, আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পশ্চিম মহাসাগরে প্রবেশ করা যাইবে। কিন্তু তাহারা অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত আর অগ্রসর হওয়া ঠিক নয় মনে করিয়া ফিরিয়া আসেন। অধ্যক্ষ তাঁহাদের প্রদত্ত সংবাদে উৎসাহিত হইয়া Santo Antonio এবং Conepcion এই দুইখানা জাহাজকে অগ্রসর হইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। Santo Antonio জাহাজের অধ্যক্ষ অন্ধকারে পলায়ন করিয়া স্পেনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন ম্যাগেলান নিজেই অবশিষ্ট তিনখানা জাহাজসহ অগ্রসর হইতে থাকেন। অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া তিনি সম্মুখে পর্যবেক্ষণের জন্য একখানা বোট (Boat) পাঠাইলেন, এবং অতঃপর কি করা উচিত, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি জাহাজের লোকদের এক বৈঠক ডাকাইলেন। অধিকাংশ লোকেই মত দিল যে, দেশে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত। কিন্তু ম্যাগেলান বলিলেন যে, "যদি আমাদিগকে চামড়া খাইয়াও থাকিতে হয়, তথাপি আমরা সম্মুখবর্তী

সমুদ্র অতিক্রম করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। কারণ আমি সম্রাট্‌কে কথা দিয়াছি যে, ভারতবর্ষে যাইবার নূতন পথ আবিষ্কার করিব।"

এই সময় বোটের লোকেরা প্রত্যাবর্তন করিয়া সংবাদ দিল যে, সম্মুখস্থ অন্তরীপ ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে গেলেই পশ্চিম দিকে মহাসমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন ম্যাগেলান উৎসাহিত হইয়া তিনখানা জাহাজকেই অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা এই অন্তরীপের নাম দিলেন বাঞ্ছিত অন্তরীপ (Cape Deseado The wished for Cape)। ২৮শে নবেম্বর তাঁহারা ম্যাগেলান প্রণালী ছাড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রণালী ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহারা উড্ডীয়মান মৎস্য প্রথম দেখিতে পান।

প্রশান্ত মহাসাগর

পিগাফেটার বর্ণনানুযায়ী

২৮শে নবেম্বর বুধবার আমরা মহাসাগরে প্রবেশ করিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য করিয়া জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। এই মহাসাগরে আমরা কোনরূপ ঝড় বাদলায় পড়ি নাই বলিয়া আমরা ইহার নাম দিই—প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাসাগর অতিক্রম করিতে আমাদের তিন মাস বিশ দিন সময় অতিবাহিত হয়। এই সুদীর্ঘ পথে আমরা টাটকা খাবার কিছুই আস্বাদ করিতে পারি নাই। সমস্ত বিস্কুট ও রুটি চূর্ণ হইয়া ধুলায় ও পোকাতে পরিণত হয়—জল পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। ম্যাগেলানের বাণী সত্য হইল, কারণ আমাদিগকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য মাস্তুলের আবরণে যে চামড়া ছিল তাহা কাটিয়া জলে ভিজাইয়া খাইতে হয়। ১৯ জন লোক দাঁতের গোড়ালী ফুলিয়া মারা যায়। এই তিন মাস শুধু আমরা চারিদিকে নীল জলরাশি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। অবশেষে ৬ই মার্চ আমরা শ্যামল তৃণাবৃত দুইটি দ্বীপ (অক্ষাংশ ১২° ডিগ্রি উত্তর, গ্রীনউইচ্ হইতে ১৪৬° পূর্ব) দেখিতে পাইলাম। অধ্যক্ষ মনে করিলেন যে, এই দ্বীপে টাট্‌কা খাবার ও জল পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই দ্বীপে অবতরণ করিতেই অসভ্য দ্বীপবাসীরা তাহাদের Canoeতে চড়িয়া জাহাজে আসিয়া আমাদের জিনিস-পত্র চুরি করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের এমন অবস্থা নয় যে, আমরা তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইতে পারি। সুতরাং আমরা তাড়াতাড়ি কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া এই চোরের দ্বীপ (Ladrone Islands) হইতে সরিয়া পড়ি।

লাড্রোন দ্বীপের পর ম্যাগেলান দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া বর্তমান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হন। এখানকার অধিবাসীরা অনেকেই কতকটা সভ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ম্যাগেলান্‌কে খাদ্যদ্রব্যাদি দিয়া আতিথেয়তা দেখায়। কিন্তু এই আতিথেয়তাই ম্যাগেলানের মৃত্যুর কারণ হইল। জুবু নামক দ্বীপের রাজা শপথ করিয়া বলেন যে, ম্যাগেলান্ যদি তাহাকে অন্য এক দ্বীপের রাজার সহিত যুদ্ধে সাহায্য করেন, তাহা হইলে সে

নিজে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হইবে এবং স্পেনের রাজার অধীনতা স্বীকার করিবে। রাজার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ম্যাগেলান্ উক্ত দ্বীপ আক্রমণ করিতে যাইয়া ১৫২১ খৃঃ অব্দের ২৭শে এপ্রিল দ্বীপবাসীদের হস্তে নিহত হন।

হতাবশিষ্ট স্পেনিয়ার্ডগণ কোনমতে জাহাজে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে। জুবু দ্বীপের খৃস্টান রাজাও তাহার কাছে ম্যাগেলান্ যে কয়জন স্পেনিয়ার্ডকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে বধ করেন। অন্য সকলে Johan Carvajo নামক নাবিকের নেতৃত্বে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া Molucca বা মসলা দ্বীপের সন্ধানে নবেম্বর মাস পর্যন্ত ঘুরিতে থাকে। ক্রমে তাহারা বোর্ণিও দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সাগু, লবঙ্গ, তরমুজ প্রভৃতি অনেক ফল—যাহা পূর্বে তাহারা কখনও দেখে নাই—তাহার সন্ধান পায়। এইস্থানে তাহারা ম্যাগেলানের স্থলে Sebastian* del Cano নামক এক ব্যক্তিকে কাপ্তেন-জেনারেল নির্বাচিত করে। বোর্ণিও হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ৬ই নবেম্বর মসলা দ্বীপে উপস্থিত হয় এবং সেইখানে তাহারা প্রথম জানিতে পারে যে, তাহারা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ জানাইল এবং জয়োল্লাসে সমস্ত কামান হইতে একসঙ্গে তোপ দাগিল। পরদিবস Alphonso de Lorosa নামক একজন পর্তুগীজ ব্যবসায়ী স্পেনিয়ার্ডদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লোরোসার নিকট হইতে তাহারা অনেক খবর জানিতে পারিল। লোরোসা প্রথম পর্তুগীজদলের সহিত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া প্রায় ষোল বৎসর যাবৎ সেখানে মসলার ব্যবসায় করিতেছেন। কিন্তু পর্তুগীজেরা ইউরোপের অন্যদেশের লোকদিগকে তাহাদের পূর্ব ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে দেয় নাই। লোরোসা আরও খবর দিলেন যে, প্রায় এগার মাস পূর্বে পর্তুগাল হইতে একখানা বড় জাহাজ মসলা ভরিতে মলাক্কা দ্বীপে আসে। সেই জাহাজের কাপ্তেন তাঁহাকে বলেন যে, পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারই একজন প্রজা ম্যাগেলান্ স্পেনের রাজার অধীনে কর্ম গ্রহণ করিয়া পাঁচখানা জাহাজ লইয়া ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। ইহাতে পর্তুগালরাজ ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ, স্পেনের রাজা যদি নূতন

* এই ব্যক্তি প্রথমতঃ সামান্য Pilot-এর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু নিজের চরিত্র ও অধ্যবসায় গুণে দলের নেতৃত্ব স্থান লাভ করেন।

পথ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্বদেশের বাণিজ্যে পর্তুগালের যে একাধিপত্য আছে, তাহা আর থাকিবে না। সুতরাং তিনি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন সর্বদা ছয়খানা যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত রাখেন; ম্যাগেলানের সন্ধান পাইলেই তিনি যেন ম্যাগেলানকে ধৃত করিয়া পর্তুগালে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে এডেনের মুসলমানদের সহিত পর্তুগীজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় রাজপ্রতিনিধি ম্যাগেলানের সন্ধানে কোন জাহাজ নিযুক্ত রাখিতে পারেন নাই।

পিগাফেটা লিখিতেছেন ঃ—লোরোসার কাছে এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের মহা ভয় উপস্থিত হইল। আমরা লোরোসাকে বুঝাইলাম যে, স্পেনের রাজা মহাপ্রতাপশালী; যদি লোরোসা আমাদিগকে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে স্পেনের সম্রাটের নিকট তাঁহার খুব পুরস্কার ও সম্মান মিলিবে। লোরোসা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ইহার পরে আমরা এক মাস কাল মসলা দ্বীপে থাকিয়া নানা নূতন নূতন জিনিস দেখিয়া কাটাইলাম। অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর আমরা মসলাদ্বীপ পরিত্যাগ করিলাম। এই সময়ে আমাদের প্রায় সমস্ত জাহাজই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, শুধু 'ভিক্টোরিয়া' কার্যক্ষম ছিল। আমরা পর্তুগীজদের ভয়ে পথিমধ্যে আর কোনও দ্বীপে থামিলাম না; জাভা ও বোর্ণিওর মধ্যবর্তী সুন্ডাপ্রণালী হইতে সোজা আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে নৌচালনা করিলাম। ৬ই মে তারিখে আমরা উত্তমাশা অন্তরীপ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু পর্তুগীজদের ভয়ে সেইখানে আর থামিলাম না—সোজা উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ৯ই জুলাই আমরা Cape Verd-এ উপস্থিত হইয়া নঙ্গর করিলাম। এই সময়ে খাওয়ার কষ্টে ও স্কার্ভি রোগে আমাদের ২১ জন লোক মারা যায়।

কেপ ভার্ডে আসিয়া দেখা গেল যে, টাট্‌কা খাবার না পাইলে আমরা সকলেই দেশে ফিরিবার পূর্বেই মারা যাইব। কিন্তু এই সমস্ত স্থান পর্তুগালের দখলে ছিল এবং পর্তুগালের রাজার কড়া হুকুম ছিল যে, যে কেহ আমাদিগকে ধরিতে পারিবে সে বহু পুরস্কার পাইবে। সুতরাং আমরা মন্ত্রণা করিয়া পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের নিকট খবর পাঠাইলাম যে, আমরা আমেরিকা হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর উত্তরণ করিয়া আসিতে বহু বিপদে পড়িয়াছি, তাঁহারা যেন অর্থের বদলে খাদ্যদ্রব্যাদি দিয়া আমাদিগকে প্রাণে বাঁচান। পর্তুগীজেরা আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে অনেক টাট্‌কা খাদ্যদ্রব্য দিল।

এইরূপ দুইবার আমাদের নৌকা ঠিক ঠিক ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তৃতীয়বারে নৌকা ঠিক সময়ে না ফেরায় আমাদের সন্দেহ হইল যে, হয়ত আমাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। কারণ, একজন নাবিক কথা প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলে যে, আমরা ম্যাগেলানের বহরের শেষ জাহাজ। সন্দেহ হওয়া মাত্রই আমরা তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া স্পেনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পরে শুনিলাম যে, পর্তুগীজরা আমাদিগকে বন্দী করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

৬ই সেপ্টেম্বর আমরা আবার **San-Lucar**-এর উপসাগরে প্রবেশ করিলাম এবং ৮ই সেপ্টেম্বর আমরা সেভিল্ বন্দরে পৌঁছিয়া সমস্ত তোপ দাগিলাম। সমস্ত পৃথিবী জানিল যে, আমরাই সর্বপ্রথমে পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়া আসিয়াছি।

আমরা স্পেন হইতে রওনা হইয়াছিলাম পাঁচখানা জাহাজে—২৩৪ জন লোক, ফিরিয়া আসিলাম একখানা জাহাজে—১৮ জন লোক।

পৃথিবী পরিক্রমণের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা হইল। তোমরা জানিতে পারিলে যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া জানেন যে পৃথিবী গোলাকার এবং স্পেন ও পর্তুগালের লোকেরা প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া এই অনুমান প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। ম্যাগেলানের দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের ফলে পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিক্রমণ সিদ্ধ হয়। যদিও এই আবিষ্কারের ফল ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের কাহিনী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ম্যাগেলানের এই আবিষ্কারে স্পেনের বাণিজ্যের কোন সুবিধা হয় নাই এবং তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ইংরেজ নাবিক ফ্রান্সিস্ ড্রেক্ দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিক্রমণ করেন।

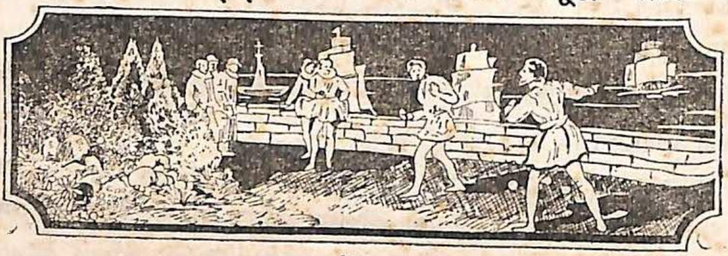
ম্যাগেলানের পৃথিবী পরিক্রমণের কাহিনী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মানুষ চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা কতদূর কাজ করিতে পারে, ম্যাগেলানের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারি। যে সকল নির্ভীক্ পুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন নূতন দেশের সংবাদ বলিয়াছেন, নূতন নূতন জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, মানুষের রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন জ্ঞানের পথে লইয়া গিয়াছেন, ম্যাগেলান ছিলেন তাঁহাদেরই একজন।

যাঁহারা কৃতী পুরুষ, তাঁহারা অনেক সময়ে আপনাদের জীবিতকালে জনসাধারণের নিকট হইতে তাঁহাদের কৃতিত্বের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিতে পারেন না। তোমরা অনেক বড়লোকের জীবনী পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে, তাঁহারা কত নির্যাতন সহিয়াছেন, কত লোকনিন্দা ও অপমান সহ্য করিয়াছেন ; এমন কি, কারাগারে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তবু তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পরে দেশের লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের দান কত বড় এবং তাঁহাদের শোণিত-ধারার মধ্য দিয়া অনাগত দেশবাসিগণের জন্য কি অতুল ঐশ্বর্য সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন।

ম্যাগেলানের জীবনেও তাহার কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। অজানা পথে, অজানা দেশের সন্ধানে, ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া সমুদ্রের বুকে, কি অসীম সাহসিকতার সহিত তিনি তরী ভাসাইয়াছিলেন—তাহা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে কত বড় সাহসী বীর তিনি ছিলেন। আজ 'ম্যাগেলান প্রণালী' তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে এবং আজ তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়া এই সাহসী বীরের কাহিনী আমাদিগকে ভুলিতে দিতেছে না।

ছয়

জন্ হকিন্‌স্ ও ড্রেকের আদি সমুদ্র-যাত্রা



স্পেনিয়ার্ডগণের নূতন জগৎ আবিষ্কারের পর হইতে স্পেনের ঐশ্বর্য এবং প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমেরিকা হইতে বহু জাহাজ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং মূল্যবান্ বাণিজ্য-দ্রব্যাদিতে বোঝাই হইয়া স্পেনের তীরে আসিয়া ভিড়িত। বলা বাহুল্য, আমেরিকার বাণিজ্য স্পেনিয়ার্ডগণের একচেটিয়া ছিল। নূতন মহাদেশ হইতে যে সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্য স্পেনে আসিত, তাহার ক্রয়-বিক্রয় শুধু স্পেন দেশেই আবদ্ধ ছিল। স্পেনিয়ার্ডগণের ইচ্ছা ছিল যে, নূতন মহাদেশের বাণিজ্য-ব্যাপারে অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি হস্তক্ষেপ না করে। সেইজন্য স্পেনের তদানীন্তন রাজা এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, স্পেনিয়ার্ডগণ নূতন জগৎ হইতে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যাদি স্পেনের অধিবাসী ভিন্ন অন্য কোন দেশের লোকের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই সময় ইংরেজ বণিকেরা ভূমধ্যসাগরের উপকূল-ভাগ দিয়া বাণিজ্য করিতেছিল। স্পেনিয়ার্ডগণ কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের সংবাদ তাহারা জ্ঞাত থাকিলেও আমেরিকায় যাইয়া তথাকার অধিবাসিগণের সঙ্গে বাণিজ্য করা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ তাহাদের ছিল না। তাহার কারণ, ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যে উপরি উপরি তখন একটু সদ্ভাব ছিল এবং পাছে নূতন মহাদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে স্পেনিয়ার্ডগণের সহিত কোনরূপ সংঘর্ষ বাধে, এই আশঙ্কায় তাহারা আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত ছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন নূতন জগতে স্পেনের অত্যধিক সাফল্যের কথা শুনিতে লাগিল, তখন তাহাদের

মনেও আমেরিকায় যাইয়া বাণিজ্য করা সম্বন্ধে এক প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। ইংরাজ-বণিকেরা ঠিক করিল—সুযোগ এবং উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পাইলেই তাহারা একবার আমেরিকায় বাণিজ্য করিতে যাইবে। রাণী এলিজাবেথের সময়ে (১৫৮৮-১৬০৩) হকিন্‌স্ নামক একজন ইংরাজ বণিক আমেরিকা হইতে আগত কোনও একজন বিশ্বাসযোগ্য লোকের নিকট শুনিতে পাইলেন যে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বীটচাষের জন্য স্পেনিয়ার্ডগণের বহু-সংখ্যক মজুর দরকার, এবং মজুরী কাজের জন্য আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা মোটেই উপযুক্ত নয়। হকিন্‌স্ সুযোগ বুঝিয়া ঠিক করিলেন যে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ গিনি অঞ্চল হইতে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগকে কৌশলে ধৃত করিয়া তাহাদিগকে নূতন জগতে লইয়া গিয়া হিস্‌প্যানিওয়া দ্বীপে স্পেনিয়ার্ডদিগের নিকট বিক্রয় করিবেন। হকিন্‌স্ স্থির করিলেন, এখন হইতে তিনি কেবল দাস-ব্যবসায়ই চালাইবেন; কারণ ইহাতে ভবিষ্যতে অনেক লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১৫৬২ খৃস্টাব্দে তিনি প্রথম আমেরিকা যাত্রা করেন। এইবারে তিনি জাহাজ বোঝাই করিয়া বহুসংখ্যক নিগ্রো দাস সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিগ্রোদিগকে স্পেনিয়ার্ডদিগের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া তদ্বিনিময়ে বহু চাম্‌ড়া, চিনি এবং মূল্যবান্ বাণিজ্যদ্রব্যাদি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে লব্ধ বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য তাহার কিছু কিছু স্পেনে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু স্পেনের তৎকালের আইনানুযায়ী স্পেনিয়ার্ডগণ তাঁহার প্রেরিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সাহসী হয় নাই।

১৫৬৪ খৃস্টাব্দে হকিন্‌স্ দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করেন। এইবারেও তিনি বহুসংখ্যক নিগ্রো দাসে জাহাজ ভর্তি করিয়াছিলেন। হকিন্‌স্ ক্যারিবিয়েন সাগরের (Caribbean sea) উপকূল ভাগ এবং জ্যামেকা, কিউবা (Cuba) প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া নিগ্রোদিগকে বিক্রয় করেন। তারপর তিনি ফ্লোরিডার উপকূল ভাগ দিয়া এবং উত্তর আমেরিকার উপকূল ভাগ দিয়া অগ্রসর হইয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপে পেঁছেন। ভবিষ্যৎ যুক্তরাজ্যের উপকূল ভাগ দিয়া ইংরেজগণ এই সর্বপ্রথম জাহাজ চালনা করেন। হকিন্‌স্ নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড হইতে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। হকিন্‌সের তৃতীয় যাত্রা ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইবারে তিনি যখন দাস বিক্রয় শেষ করিয়া দেশের দিকে ফিরিতেছিলেন, তখন মেক্সিকোর উপকূলে তাঁহার জাহাজগুলি এক

ঝটিকার আবর্তে পড়িয়া দিশাহারা হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। হকিন্‌স্ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটস্থ স্পেনীয়দের অধিকৃত একটি বন্দরে অনেক কষ্টে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বন্দরের নাম সেণ্টজুয়ান ডে ওলোয়া (**St Juan de Ullua**)। হকিন্‌স্ স্পেনিয়ার্ডদিগকে বলিলেন যে, তাঁহার এখানে আসিবার কোনরূপ মন্দ অভিসন্ধি নাই ; অধিকন্তু তাহারা যদি তাঁহাকে খাদ্য-দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করে, তাহা হইলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন। হকিন্‌স বন্দরে আশ্রয় লইবার অনতিকাল পরেই স্পেন হইতে একটি জাহাজ আসিয়া বন্দরে প্রবেশ করিল। তিনি নবাগত স্পেনিয়ার্ডগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেনিয়ার্ডগণ সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তাঁহার জাহাজ আক্রমণ করে। এই সময় হকিন্‌সের সহিত ফ্রান্সিস্ ড্রেক নামক একজন অসমসাহসী ইংরেজ নাবিক ছিলেন। হকিন্‌স্ যখন পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্য করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত ফ্রান্সিস্ ড্রেকের পরিচয় হয়। তাঁহার তৃতীয় সমুদ্র-যাত্রায় ফ্রান্সিস্ ড্রেক তাঁহার স্বীয় জাহাজ 'জুডিথ' (**Judith**) লইয়া হকিন্‌সের সহগামী হইয়াছিলেন। স্পেনিয়ার্ডগণের আক্রমণে ইংরেজগণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কতক জাহাজ স্পেনিয়ার্ডদিগের হাতে পড়িল, কতক সমুদ্রে নিমজ্জিত হইল এবং কতক বা গোলাবারুদের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এই প্রলয় কাণ্ডের ভিতর কেবল ড্রেকের 'জুডিথ' এবং আর একটি ছোট জাহাজ পলায়নের সুযোগে রক্ষা পাইল। অন্য জাহাজটির নাম 'মিনিয়ন' (**Minion**)। ড্রেক্ ফ্লোরিডার উপকূল হইতে জাহাজ ছাড়িয়া বহুবিধ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া ছয় সপ্তাহ পরে স্পেনের উপকূলে আসিয়া উপনীত হন এবং ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালের মাউণ্ট উপসাগরে পৌঁছেন। এই যাত্রায় আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে ইংরেজ নাবিকদিগকে কিরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে হকিন্‌স্ বলিয়াছেন—"আমাদের এই যাত্রার সমুদয় দুঃখ ও বিপদের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে লেখককে আত্মোৎসর্গকারী মহাপুরুষদিগের কার্যকলাপ বর্ণনা করিবার ধৈর্য এবং দুঃখীর দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিবার অনুভূতি লইয়া লেখনী ধারণ করিতে হইবে।"

ইংরেজরা এত কষ্ট সহ্য করিলেও তাঁহাদের এই বাণিজ্য-যাত্রা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, নূতন জগতের বাণিজ্য-

ব্যাপারে স্পেনিয়ার্ডগণ সহজে তাঁহাদিগকে আমল দিবে না। কাজেই, তাঁহাদিগকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ড্রেকের বর্ণিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইংরেজদিগের মনে স্পেনিয়ার্ডদিগের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত স্পেনের বিপক্ষতা করা ক্ষুদ্র ইংল্যাণ্ডের সাধ্য ছিল না, সেইজন্য ড্রেক জলদস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। ড্রেক নূতন জগতে স্পেনাধিকৃত রাজ্যগুলি এবং তথায় স্পেনিয়ার্ডদিগের প্রভাব ও আধিপত্য সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইবার জন্য ইহার



স্যার ফ্রান্সিস্ ড্রেক (একখানা প্রাচীন চিত্র হইতে)

পর দুইবার আমেরিকা যাত্রা করেন। তারপর ১৫৭২ খৃস্টাব্দে তিনি ডারিয়েন যোজকের (**Isthmus of Darien**) সন্নিহিত উপকূলভাগে স্পেনিয়ার্ডদিগকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে দুইটি বড় জাহাজ এবং ছোট ছোট কতকগুলি ডিঙ্গী লইয়া রওনা হইলেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া তিনি একটি ছোট এবং সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিলেন। তাঁহারা ডিঙ্গীগুলিকে ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ড্রেক শুনিয়াছিলেন যে, পেরুর

ধনরত্নাদি বড় বড় জাহাজে (Galleon) করিয়া ডারিয়েন যোজকের পশ্চিম উপকূলে আনীত হয় এবং সেখান হইতে খচ্চর-পৃষ্ঠে যোজকের উপর দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে কোন একটি বন্দরে নীত হয়। এই বন্দরের নাম Nombre de Dios। এই বন্দর হইতে ঐ সমস্ত ধনরত্ন স্পেনে চালান দেওয়া হয়। কাজেই, এই বন্দরেই ড্রেক স্পেনিয়ার্ডদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ড্রেক বন্দরে উপস্থিত হইয়া অধিকাংশ স্পেনিয়ার্ডকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং তথাকার সমুদয় ধনরত্নের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাহা জাহাজে লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অলক্ষ্যে একটি গুলি আসিয়া ড্রেকের শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি আহত হইয়া ভূপাতিত হন। তাঁহার লোকজন তাঁহাকে বহন করিয়া জাহাজে লইয়া যায়। কারণ, তাহাদের কাছে মূল্যবান ধনরত্ন অপেক্ষা তাহাদের অধ্যক্ষের জীবন আরও অধিক মূল্যবান্ ছিল। ইহার পর কয়েক সপ্তাহের ভিতর ইংরেজ নাবিকগণ স্পেনিয়ার্ডদিগের বহু বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করে। স্পেনিয়ার্ডগণ বহুবিধ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও ইংরেজদিগের এই পুনঃ পুনঃ অতর্কিত বাণিজ্যপোত আক্রমণে বাধা দিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। এই সময় আমেরিকার অন্তর্ভাগে Cimarrous-নামক এক জাতীয় অর্ধ সভ্য লোক বাস করিত। তাহাদের সহিত স্পেনিয়ার্ডদিগের প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত। কারণ, স্পেনিয়ার্ডরা তাহাদিগের সহিত খুব খারাপ ব্যবহার করিত। ড্রেক স্পেনিয়ার্ডদিগের উপর অসন্তুষ্ট এই সমস্ত আদিম অধিবাসীদের সহিত যোগদান করেন এবং তাহারাও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

বহুদিন নীরব অপেক্ষার পর আদিম অধিবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, পেরুর ধন-রত্ন শীঘ্রই ডারিয়েন যোজকের উপর দিয়া Nombre de Dios বন্দরের দিকে রওনা হইবে। ড্রেক তাঁহার লোকজন লইয়া এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাত্র পনের জন সঙ্গী এবং ত্রিশ জন আদিম অধিবাসী লইয়া ড্রেক এই বিপৎসঙ্কুল অভিযানে অগ্রসর হইলেন। সমুদ্রের উপকূল ভাগে বন্দরের নিকটবর্তী একটি ঢালু প্রান্তরে একটি বনের মধ্যে তিনি আপনার লোকজন স্থাপন করিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যপরিপূর্ণ সেই শ্যামল বনানীর এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া ড্রেক চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমদিকে তিনি অনন্ত জলরাশি দেখিতে পাইলেন। পশ্চিমে প্রশান্ত

মহাসাগরের দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশি তাঁহার দৃষ্টি মুগ্ধ করিয়া দিল। বারিধিবক্ষে সতত সঞ্চরমাণ ঊর্মিমালার কল্লোলগীতি যেন তাঁহাকে কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহ্বান করিল। তাঁহার মনে ঐ সমুদ্রে যাত্রা করিবার জন্য এক প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন এক দিন তিনি ঐ সমুদ্রে যাত্রা করিবেন।

অল্পকাল পরেই স্পেনিয়ার্ডদিগের পূর্বোক্ত খচ্চরবাহিনী তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু ড্রেকের দলের কোন লোকের অসাবধানতাবশতঃ স্পেনিয়ার্ডগণ ড্রেকের এই অতর্কিত আক্রমণের কথা জানতে পারিয়া স্বর্ণের পরিবর্তে খচ্চর-পৃষ্ঠে কেবল কতকগুলি ইট-পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছিল। কাজেই, ড্রেক এবং তাঁহার লোকজনের ষড়যন্ত্র এবারে ব্যর্থ হইল। তথাপি তাঁহারা নিরুৎসাহ না হইয়া Nombre de Dios বন্দরের অনতিদূরে আরও একটি অশ্বতর-বাহিত ধন-রত্নের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেইবার তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল।

তারপর ড্রেক যখন দেখিলেন যে, তাহারা যথেষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন তিনি লোকজন লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার প্রয়াসী হইলেন। ড্রেক অবশিষ্ট দুইখানা জাহাজ লইয়া রওনা হইলেন এবং ১৫৭৩ খৃস্টাব্দের ৯শে আগস্ট দেশে পেঁছিলেন। ইংলণ্ডে পেঁছিলে দেশের লোকেরা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল এবং উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। রাণী এলিজাবেথ ড্রেকের জলদস্যুতার এই নূতন সাফল্যে বিশেষ প্রীতা হইলেন না; কারণ তিনি দেখিলেন যে, এই ড্রেকের জলদস্যুতার জন্যই স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের সদ্ভাব বজায় রাখা দিন দিন কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

চারি বৎসর পরে যখন স্পেন পর পর ইংলণ্ডের অনেকগুলি বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন করিল, তখন রাণী এলিজাবেথ ড্রেকের প্রস্তাবিত কার্যাবলীই ইহার যথাযথ প্রতিকারস্বরূপ মনে করিলেন। ড্রেক বলিলেন যে, তিনি এক রণতরীর বহর লইয়া গিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে স্পেনাধিকৃত বন্দর এবং জাহাজসকল আক্রমণ করিবেন। রাণীর মন্ত্রী এবং পারিষদ্‌বর্গ রাজনৈতিক কারণে মৌখিক এই প্রস্তাবে অসম্মতি দেখাইলেন, কিন্তু রাণী গোপনে ড্রেককে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। কাজেই, যে সমুদ্র-যাত্রার জন্য একদিন ডারিয়েন যোজকের বৃক্ষোপরি তাঁহার মনে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, অতি সহজেই তাঁহার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার সুযোগ মিলিল; আয়োজন চলিতে লাগিল।

ড্রেকের পৃথিবী পরিক্রমণ

ড্রেক্ ১৫৭৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর প্লিমাউথ বন্দর হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে পেলিকান (The Pelican) এলিজাবেথ (The Elizabeth) মেরিগোল্ড (The Marigold), এবং সোয়ান (The Swan) নামক চারিটি জাহাজ লইলেন। তিনি একটি ছোট ডিঙ্গীও সঙ্গে লইয়াছিলেন। জাহাজ বন্দরের বাহির হইয়া ইংলিশ প্রণালীতে পৌঁছিলে এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। ড্রেক্ এবং তাঁহার লোকজন জাহাজ লইয়া বন্দরে ফিরিয়া আসিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর আবার তাঁহারা ইংলণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইলেন।

বার দিন পর্যন্ত ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে জাহাজ চালাইয়া তাঁহারা মরোক্কোর উপকূলে পৌঁছিলেন। এস্থানের অধিবাসিগণকে প্রথমতঃ ইংরেজগণ বন্ধুভাবাপন্ন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা একজন ইংরেজ-নাবিককে কৌশলে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এখান হইতে তাঁহারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া ভার্ড অন্তরীপে (Cape Verde) উপস্থিত হন। ভৌগোলিক অবস্থানানুযায়ী শীতকাল হইলেও তাঁহারা সেই অন্তরীপে তখন বিবিধ সুমিষ্ট ফল-আস্বাদন করিয়াছিলেন। তারপর সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে বিষুবন্ রেখার অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে ড্রেক ক্রমাগত পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাইতে থাকেন। আট সপ্তাহ পর্যন্ত ঝড়-বাদল এবং নানা দুর্যোগের ভিতর দিয়া জাহাজ চালাইয়া অবশেষে তাঁহারা ব্রেজিলের উপকূলে পৌঁছেন। এই দেশের আদিম অধিবাসিগণ ড্রেকের জাহাজের ধ্বংসের জন্য নানা দেবদেবীর মূর্তির নিকট অর্ঘ্য দান করিয়াছিল।

দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্লাটা নদীতে (River Plata) প্রবেশ করিলেন। এখানে তাঁহারা স্বচ্ছ পানীয় জল প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দূরে তাঁহারা একটা সুন্দর বন্দর দেখিতে পাইলেন। এই নদীতে তাঁহারা বহু সীলমৎস্য শিকার করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা পাটাগোনিয়াদেশের উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। এই দেশের লোকেরা ড্রেক এবং তাঁহার লোকজনের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছিল। এমন কি, তাহারা ড্রেকের সহিত বাণিজ্যাদিতেও লিপ্ত হইয়াছিল। সেণ্ট জুলিয়ান বন্দরে উপস্থিত হইয়া ড্রেক জানিতে পারিলেন যে, ক্যাপ্টেন ডাউটি (Captain Doughty)

নামক তাঁহার একজন প্রধান সঙ্গী তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাউটির সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া তাঁহাকে ইংলণ্ডের তদানীন্তন আইনানুসারে অভিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদন্ডের বিধান করিলেন।

এই সেণ্ট জুলিয়ান বন্দরেই ম্যাগেলান শীতকালটা কাটাইয়াছিলেন। সেণ্ট জুলিয়ান বন্দরে দুই মাস অবস্থান করিয়া ড্রেক ম্যাগেলান প্রণালীর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তিন দিবস পরে সেখানে পেঁছেন। এই প্রণালীতে ড্রেক্ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। কারণ, স্থানে স্থানে প্রণালীর গতি এত বক্র যে, ইহার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাওয়া খুব কষ্টকর। এই প্রণালী এত গভীর যে, ইহাতে সব স্থানে নোঙ্গর করা যাইত না। প্রণালীর উভয় পার্শ্বের পর্বতের উচ্চতা দর্শনে তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এই স্থানে একটি দ্বীপে তাঁহারা প্রায় ৩০০০ পাখী শিকার করিয়াছিলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ড্রেক ম্যাগেলান প্রণালী হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে পতিত হইলেন। এই সমুদ্রকে ম্যাগেলান প্রশান্ত মহাসাগর নাম দিয়াছিলেন। ড্রেক কিন্তু এই মহাসাগরে বিন্দুমাত্রও শান্তভাব দেখিতে পাইলেন না। তিনি ম্যাগেলান প্রণালী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইবামাত্রই এক ভীষণ বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র ভৈরব রবে গর্জন করিয়া উঠিল। তারপর এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। এই ঝটিকার সময় 'মেরিগোল্ড' জাহাজ-খানি তাহার সমস্ত আরোহী সমভিব্যাহারে 'ম্যাগেলানবর্ণিত প্রশান্ত মহাসাগরে' নিমজ্জিত হয়। ড্রেক্ অনন্যগতি হইয়া টেয়ারাডেল ফিওগো (Tirra del Fuego) দ্বীপপুঞ্জে ফিরিয়া আসেন। এই দ্বীপপুঞ্জে আসিবার সময় পথে এলিজাবেথ (The Elizabeth) জাহাজখানি ড্রেকের নিজস্ব পেলিকান জাহাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। এলিজাবেথের ক্যাপ্টেন, ড্রেকের দর্শন না পাইয়া ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় হইতে ড্রেকের পেলিকান জাহাজকে Golden Hind নামে অভিহিত করা হইত।

যদিও তখন ড্রেকের মাত্র একটি জাহাজ অবশিষ্ট ছিল, তথাপি তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে ভয় পাইলেন না। চিলি দেশের উপকূল ভাগ দিয়া তিনি উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে গিয়া তিনি কোনও প্রয়োজন বশতঃ সেখানকার উপকূলে জাহাজ ভিড়াইলেন। এই অঞ্চলের

অধিবাসিগণ স্পেনিয়ার্ডগণের অযথা অত্যাচারে তাহাদের উপর সবিশেষ অসন্তুষ্ট ছিল। কাজেই, তাহারা স্বভাবতঃ ড্রেক্‌কে স্পেনিয়ার্ডগণের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে রাজী হইল। ড্রেক্ ইহাদের নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন যে, নিকটবর্তী ভ্যালপারেসো (Valparaiso) বন্দরে একটা টাকা-পয়সা এবং মালপত্র বোঝাই স্পেনিস্ জাহাজ নোঙ্গর করিয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জাহাজ এবং লোকজন লইয়া উক্ত স্পেনিস্ জাহাজ অধিকার করিতে চলিলেন। তিনি বন্দরে যাইয়া দেখিলেন যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্পেনিয়ার্ড ঐ জাহাজে অবস্থান করিতেছে এবং বন্দরেও বেশি লোকজন নাই। ড্রেকের অতর্কিত আক্রমণে স্পেনিয়ার্ডগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ড্রেক সহজেই জাহাজ এবং বন্দর দখল করিয়া সমস্ত টাকা-পয়সা এবং বাণিজ্য-দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিলেন। ইহার পর একজন বিশ্বস্ত গ্রীক্ নাবিকের সাহায্যে তাহারা আরও উত্তরে লিমা (Lima) বন্দরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহারা স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া স্পেনিয়ার্ডদিগের বহু টাকা-পয়সা লুঠতরাজ করেন। একস্থানে একটি মৃত ব্যক্তির আচ্ছাদন হইতে তাঁহারা তেরটি রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর এক স্থানে তাঁহারা আটটি পেরুদেশের মেষ (Llamas) প্রাপ্ত হন।

লিমা বন্দরে বারটি জাহাজ অবস্থান করিতেছিল। ড্রেক্ সমস্তগুলিই লুণ্ঠন করিলেন। এই সমস্ত জাহাজ হইতে ড্রেক অনেক রেশম এবং সুতার কাপড় সংগ্রহ করিলেন। তারপর ড্রেক শুনিতে পাইলেন যে, অল্প কিছু সময় পূর্বে একটা বড় স্পেনিশ জাহাজ (Galleon) অনেক মূল্যবান মালপত্র বোঝাই হইয়া উত্তরে পানামা যোজকের অভিমুখে রওনা হইয়াছে। তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া উহার পশ্চাতে ছুটিয়া তাহাকে ধৃত করিলেন এবং ইহার সমস্ত মালপত্র লুঠ করিলেন। এইরূপে অনেক জাহাজ লুঠ করিয়া এবং অনেক টাকা-পয়সা এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ড্রেকের প্রতিহিংসার আগুন নিবিল। তিনি ভাবিলেন, স্পেনিয়ার্ডগণের অন্যায়ের প্রতিশোধের জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। কাজেই, এখন তাঁহার দেশে ফিরিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ড্রেক ভাবিলেন, পুনরায় ম্যাগেলান প্রণালীর দিকে গমন করা তাঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তিনি স্পেনিয়ার্ডদিগের যে-সমস্ত জাহাজ এবং বন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য হয়ত তাহারা সর্বদাই

সচকিত রহিয়াছে। তারপর ম্যাগেলান প্রণালীর সম্মুখে সমুদ্রবক্ষের ঝটিকার প্রচণ্ডতায় হয়ত তাঁহার জাহাজের দুর্দশার সীমা থাকিবে না। কাজেই, নানা-দিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া ক্রমাগত জাহাজ চালাইয়া মসলা দ্বীপে (Spice Islands) পেঁছিবেন এবং সেখান হইতে আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া দেশে ফিরিবেন।

জাহাজের পক্ষে অনুকূল বায়ু পাইবার জন্য ড্রেক এবং তাঁহার সঙ্গিগণ ক্রমশঃ উত্তর দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। ছয় সপ্তাহ যাবৎ The Golden Hind ক্রমাগত এইভাবে চলিলে তাঁহারা এক বরফের শীতল দেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহারা একটি সুন্দর উপসাগর (Bay) দেখিতে পাইয়াছিলেন। বর্তমান সানফ্রানসিস্কো (San Francisco) সহর এই উপসাগরের উপরেই অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ ড্রেকের সহিত খুবই সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, আগন্তুক ইংরেজগণ হয়ত কোনও দেবতা হইবেন। সেজন্য তাহারা নানারূপ পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তাহাদের রাজা ড্রেককে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। ড্রেক রাণী এলিজাবেথের নামে এই দেশ গ্রহণ করিলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন New Albion। ড্রেক্ এইস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহাদের সেস্থানে অবস্থানের চিহ্ন রাখিবার জন্য কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত স্তম্ভে তিনি রাণী এলিজাবেথের নাম খোদিত করাইয়াছিলেন।



স্যার ফ্র্যান্সিস্ ড্রেকের প্রস্তর-গঠিত মূর্তি

এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া ড্রেক পুনরায় উন্মুক্ত বারিধিবক্ষে জাহাজ ভাসাইলেন। সত্তর দিন ধরিয়া The Golden Hind সোজা পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। তারপর ড্রেক্ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেই ম্যাগেলান দ্বীপবাসীদিগের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এখান হইতে ড্রেক মসলা দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

মসলা দ্বীপের অধিবাসিগণ ড্রেকের খুব সম্বর্ধনা করিয়াছিল। তাহাদের রাজা স্বয়ং আসিয়া ড্রেক্‌কে জাহাজ হইতে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। ড্রেক্ এই দ্বীপে কয়েকদিন খুব শান্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রমণে বাহির হইয়া একস্থানে বেশীদিন থাকা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। এই দ্বীপ পরিত্যাগ করিবার সময় অধিবাসিগণ তাঁহাকে অনেক তণ্ডুল, চিনি, কলা ও মসলা উপহার দিয়াছিল।

মসলাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পথে ড্রেক এবং তাঁহার লোকজন এক দ্বীপে একটি আশ্চর্যকর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কতকগুলি বৃক্ষের ভিতরে প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় এক ঝাঁক জ্বলন্ত পোকা উড়িয়া বেড়াইতেছিল। (ভারতবর্ষে ইহাদিগকে 'জোনাকী পোকা' বলা হয়)। দূর হইতে তাহাদের নিকট মনে হইয়াছিল যেন সমস্ত বৃক্ষগুলিই অগ্নিতে জ্বলিতেছে।

মসলা দ্বীপপুঞ্জের বহু দ্বীপের ভিতর দিয়া পথ খুঁজিয়া পাওয়া বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল। একস্থানে জাহাজ একটি নিমজ্জিত পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায় এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টা আবদ্ধ থাকার পর পুনরায় জলে ভাসে। তারপর জাভাদ্বীপ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চলিতে থাকেন। উত্তমাশা অন্তরীপে পেঁছিলে তাঁহাদের মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহারা এই অন্তরীপে জাহাজ ভিড়াইলেন না—অন্তরীপ ঘুরিয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন এবং প্রায় একমাস পরে গিনি উপকূলের সিয়েরালিয়োন বন্দরে উপস্থিত হইলেন।

১৫৮০ খৃস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর, The Golden Hind তিন বৎসর সমুদ্র-যাত্রার পর প্লিমাউথ বন্দরে প্রবেশ করিল। রাণী এলিজাবেথ ড্রেককে তাঁহার অসমসাহসিক বীরত্বব্যঞ্জক কার্যের জন্য 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে ড্রেকই সর্বপ্রথম পৃথিবী পরিক্রমণ করেন। ইংরেজদের মতে ড্রেক মস্ত বীর, কিন্তু স্পেনের ইতিহাসে তাঁহাকে "নিষ্ঠুর জলদস্যু" বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

সাত

রঞ্জন-আলো

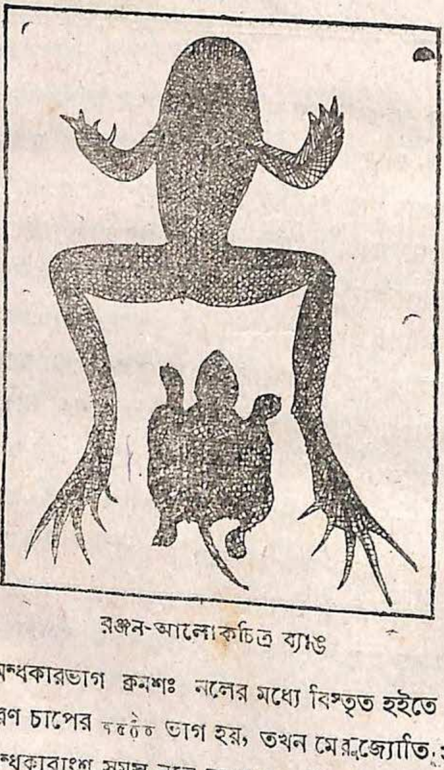


রঞ্জন-আলো বা এক্স-রেস্ এর কথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। যদি কখনও দুষ্টামি করিতে গিয়া হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া থাক, তাহা হইলে ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই তোমাকে রঞ্জন-আলোর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কিরূপ ভাবে হাড়টি ভাঙ্গিয়াছে, কি অবস্থায় উহা আছে, তাহা জানিবার জন্য হাসপাতালে লইয়া যাইয়া রঞ্জন-আলো দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারে চিকিৎসাজগতেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কত দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার সুযোগ যে এই আলোর সাহায্যে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বড় বড় সহরের হাসপাতালে, কলেজের ল্যাবরেটরিতে ও অনেক ডাক্তারখানায় রঞ্জন-আলোর যন্ত্রপাতি থাকে। তোমরা এই সব যন্ত্রপাতি দেখিও এবং কিভাবে উহা ব্যবহার করিতে হয় তাহাও লক্ষ্য করিও, ইহাতে বেশ আনন্দ পাইবে। এইবার তোমাদের নিকট রঞ্জন-আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বেশ মন দিয়া পড়িয়া উহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

কোনও কাচের নলের দুই প্রান্তে দুইটি ধাতু-ফলক স্থাপন করিয়া যদি ঐ দুই প্রান্ত সম্পূর্ণরূপে আঁটিয়া দেওয়া যায়, এবং নলের পার্শ্বস্থ কোনও ছিদ্র-দ্বারা যদি নলটিকে বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া নলমধ্যস্থ বায়ু-নিষ্কাশন করা যায়, তাহা হইলে ঐ নলকে **Vacuum Tube** বা বায়ুশূন্য নল বলা যায়। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দিয়া আমরা নলের অভ্যন্তরভাগ হইতে ইচ্ছামত বায়ু সরাইয়া চাপ হ্রাস করিতে পারি। এখন ধাতু-ফলক দুইটিকে তার দিয়া

তড়িৎ প্রবর্তক কুণ্ডলীর (Induction Coil) দুই মেরুর সহিত যোগ করিলে, নলের মধ্যে নানা বিচিত্র বর্ণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে থাকে। রীতিমত পর্যবেক্ষণ করিলে বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে এই কয়টি অংশ দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রথমতঃ যোগমেরু (Anode)-র চারিপার্শ্ব হইতে একপ্রকার গাঢ় লালবর্ণের জ্যোতি নির্গত হয়, তাহার পরে খানিকটা স্থানে বিক্ষিপ্ত আলো স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। বিয়োগমেরু (Cathode) হইতে সাধারণতঃ বেগুনে রঙের জ্যোতি বাহির হয়। জ্যোতির পরে খানিকটা আঁধার (Crookes' dark space) হইয়া থাকে।

বায়ুর চাপ আস্তে আস্তে কমাইলে বিদ্যুৎবৎপ্রবাহে নানারূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। তখন উজ্জ্বল মেরু-জ্যোতিগুলি আস্তে আস্তে কমিতে থাকে,



রঞ্জন-আলোকচিত্র ব্যাঙ

এবং ক্রুকসের অন্ধকারভাগ ক্রমশঃ নলের মধ্যে বিস্তৃত হইতে থাকে। বায়ুর চাপ যখন সাধারণ চাপের ১/৫০০০ ভাগ হয়, তখন মেরুজ্যোতি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়, ক্রুকসের অন্ধকারাংশ সমস্ত নলে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নলের পার্শ্বদেশ হইতে এক প্রকার তীব্র সবুজ রঙের প্রস্ফুরক (Phosphorescent) আলো নির্গত হইতে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে ক্রুক্‌স, ভালে এবং জার্মেনীতে প্লুকার, হিটফ, গোল্ডস্টাইন্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রস্ফুরক আলোর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে নলের মধ্যে একটি ক্রস্‌ বা অন্য কোনও পদার্থ স্থাপন করিলে, নলের পার্শ্বদেশে ছায়া পড়ে, অর্থাৎ সেই স্থান হইতে আর প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয় না। যদি নলের মধ্যে দুইখানি পরদা রাখা যায় তাহা হইলে ঐ বিন্দু দুইটির যোজক-রেখা যে স্থানে নলের পার্শ্বে আঘাত করে, শুধু সেই স্থান হইতেই প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয়। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে যোগমেরু (**Anode**) যেখানেই থাকুক না কেন, বিয়োগমেরু (**Cathode**) হইতে বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত কণা সকল মেরুর পৃষ্ঠে লম্বভাবে নির্গত হইয়া সরল রৈখিক পথে ধাবিত হয়। তাহারা যে স্থানে নলকে আঘাত করে সেইস্থান হইতেই প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয়। যদি বিয়োগমেরু কুব্জপৃষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কণা সন্ধি-বিন্দুতে (**Focus**) সংহত হয়। ঐ সন্ধি-বিন্দুতে ধাতুফলক রাখিলে অনেক সময় তাহা গলিয়া যায়; অন্যত্র ধাতু-ফলক হইতে পূর্বোক্ত তীব্র প্রস্ফুরক রশ্মি নির্গত হইতে থাকে।

যদি এক সরল-রৈখিক পথে ধাবিত বিয়োগ-রশ্মির কণাগুলিকে কোনও চুম্বকের দুই মেরুর মধ্য দিয়া নেওয়া যায় তাহা হইলে রশ্মির পথ সম্মুখের দিকে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়। যদি কোনও তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্য দিয়া রশ্মিকে চালনা করা হয়, তাহা হইলে যেদিকে যোগমেরু, রশ্মি সেইদিকে ঘুরিয়া যায়। এই উপায়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক পেরিন্‌ প্রমাণ করেন যে, রশ্মিগুলি সরল রৈখিক পথে ধাবমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি এবং এই কণাগুলি বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত।

ইংল্যাণ্ডে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক স্যার জে. জে. টমসন্‌ ও জার্মেনী **Carlruhe** বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেনার্ড প্রমাণ করেন যে, এই কণাগুলির ওজন হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের প্রায় ১/১৮০০ অংশ এবং তাহারা সকলেই প্রায় এক পরিমাণ তড়িৎ বহন করে। অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই কণাগুলি যে তড়িৎ বহন করে, সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ তড়িৎ থাকিতে পারে না। সুতরাং উহাকে তড়িতের পরমাণু আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তড়িতের পরমাণুর বেগ আলোর বেগের ১/১০০ হইতে প্রায় ·৯৮ পর্যন্ত হইতে পারে। এই তড়িতের কণাকে তাড়িত-রেণু বলে।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে জার্মেনীর ভুর্জবার্গ (Wurzuburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক রঞ্জন (Rontgen) এইরূপ নল লইয়া অদৃশ্য আলো সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন। অদৃশ্য আলো কাহাকে বলে একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে।

কোনও ত্রি-শির কাচের (Prism) ভিতর দিয়া সূর্যরশ্মি প্রবেশ করাইলে অপর পার্শ্বের পরদায় রামধনুর সমস্ত বর্ণের সমাবেশ লক্ষিত হয়। সাদা রশ্মি সাতরঙের সমষ্টিতে গঠিত এবং উহা যখন বায়ু হইতে একবার কাচে প্রবেশ করে এবং পরে কাচ হইতে পুনরায় বায়ু নির্গত হয়, তখন এই বিভিন্ন রশ্মিগুলি বিভিন্ন পরিমাণে তির্যক্‌বর্তিত হইয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। লাল আলো সবচেয়ে কম তির্যকবর্তিত হয়, বেগুনে আলো সবচেয়ে বেশী তির্যক্‌-বর্তিত হয়। এইরূপে একটি সরু আলোকরশ্মি বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহাকে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) বলে। কিন্তু সাদা আলোতে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকারের আলো আছে—আমরা খালি চোখে তাহাদিগকে ধরিতে পারি না, কিন্তু বিশেষ যন্ত্রযোগে তাহারা শীঘ্র ধরা পড়ে। লালের উপর অংশে তাপমান যন্ত্র রাখিলে তাপমান শীঘ্র বাড়িয়া যায়। বেগুনের নীচের অংশে কোনও প্রস্ফুরক পদার্থ রাখিলে তাহা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণচ্ছত্র শুধু একদিকে লাল, অপর দিকে বেগুনে রং এই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের চক্ষু তত সূক্ষ্ম যন্ত্র নয় বলিয়া আমরা লালের উপর দিকের এবং বেগুনের নীচের দিকের অন্যান্য আলো ধরিতে পারি না। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতে আলোক আকাশের স্পন্দনজনিত তরঙ্গশ্রেণী। বৈজ্ঞানিকগণ বিশিষ্ট উপায়ে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, লাল আলোর দৈর্ঘ্য $\cdot৭৩ \times ১০$ $১০^{-৫}$ c. m. আর বেগুনে আলোর দৈর্ঘ্য $\cdot৪৩ \times ১০^{-৫}$।

জার্মেনীর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হার্ত্‌জ প্রমাণ করেন যে, যদি কোনও তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র স্বতঃপ্রবর্তক কুণ্ডলী (Self Induction Coil) এবং তাড়িতাধারের (Capacity) সহিত এক শ্রেণীতে (Series) যুক্ত থাকে, তাহা হইলে যন্ত্র চালাইলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। স্বতঃপ্রবর্তক কুণ্ডলী এবং আধারের পরিমাণ অনুসারে এই তরঙ্গের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হার্ত্‌জের পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, আলোর তরঙ্গ ও এই তড়িত-জাত তরঙ্গ, উভয়ে একই আকাশের স্পন্দনজাত, শুধু উভয়ের মধ্যে পরিমাণের তফাৎ

মাত্র। হার্ত্জের পরে অনেক বৈজ্ঞানিক তড়িৎ-যন্ত্রদ্বারা অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ, এবং নানাবিধ উপায়ে দীর্ঘ আলোক বা তাপের তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া উভয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যে তাড়িতজাত তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য ৪ centimetre। জার্মেনীতে রুবেন্স সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ লোহিতাতীত তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য ৩·১৩ m. m.। আচার্য বসুর পরে জার্মেনীর অধ্যাপক ফন্‌রেয়ার আরও ক্ষুদ্র তাড়িত-তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য দুই মিলিমিটার মাত্র। সুতরাং এখনও আকাশের তরঙ্গের পূর্ণ শৃঙ্খলে আড়াই সপ্তক ব্যবধান আছে।

যাহা হউক, রঞ্জন হিটফের নল হইতে অদৃশ্য আলো উৎপন্ন হয় কিনা তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন।

অদৃশ্য আলো ধরিবার জন্য তিনি নল হইতে খানিক দূরে একটা Barium platino-cyanide পরদা রাখিয়াছিলেন। এই পরদাতে অদৃশ্য আলো পড়িলে উহা হইতে প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে।

নলে যাহাতে বাহিরের আলো প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি কালো কাগজ দিয়া নলটাকে সম্পূর্ণ মুড়িয়া তাড়িতযন্ত্র চাপাইয়া দেন। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে দূরস্থ পর্দা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতেছে।

রঞ্জন এই দৃশ্যে দেখিয়াই উহার সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, তাড়িতরেণু যে স্থানে কাচের নলকে আঘাত করে সেই স্থান হইতে এক প্রকার নতুন অদৃশ্য আলো নির্গত হয়। এই আলো পর্দার উপর পড়িলে পর্দা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো বাহির হইতে থাকে।

পরীক্ষাতে এই নূতন আলোর নানা আশ্চর্যজনক গুণ ও ধর্ম বাহির হইয়া পড়িল। কাঠ, প্রাণিদেহের মাংস, কাগজ ইত্যাদি যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়া সাধারণ আলো যাতায়াত করিতে পারে না, এই নূতন আলোক অনায়াসে তাহাদের ভিতর দিয়া যাইতে পারে। যেমন কোনও কাচের বাক্সকে সাধারণ আলোক দ্বারা আলোকিত করিলে অপর পার্শ্বস্থ পরদায় শুধু বাক্সের মধ্যস্থিত মুদ্রাদির ছায়া পড়ে, বাক্সের ছায়া পড়ে না, সেইরূপ কাঠের বাক্সকে এই নূতন আলো দ্বারা আলোকিত করিলে পরদায় শুধু মধ্যস্থ টাকা-পয়সার ছায়া পড়ে।

মানবদেহের কোন অংশে রঞ্জন-আলো প্রয়োগ করিলে পরদায় শুধু কঙ্কালের ছায়া পড়ে। রঞ্জন-আলোর এই অদ্ভুত ধর্ম থাকায় উহা এখন অস্ত্র-চিকিৎসায় খুব ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রঞ্জন প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে এই নূতন আলো সাধারণ আলোর মত ধর্মবিশিষ্ট—কিন্তু শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পূর্বের সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। যদি কোন সাধারণ আলোকরশ্মি কোন ধাতুর সমতল পৃষ্ঠের উপর তির্যক্‌ভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে উহা ধাতুপৃষ্ঠ হইতে লম্বের সহিত সমান কোণ করিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ধাতুপৃষ্ঠ সমতল না হইয়া যদি বন্ধুর হয়, তাহা হইলে উহা ধাতুপৃষ্ঠ হইতে লম্বের সহিত সমান কোণ করিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ধাতুপৃষ্ঠ সমতল না হইয়া যদি বন্ধুর হয়, তাহা হইলে আলোর রশ্মি এক বিশিষ্ট দিকে প্রতিফলিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে ইংরাজীতে Diffuse Reflexion বলে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে রঞ্জন-আলো সাধারণ সমতল ধাতুপৃষ্ঠ হইতে নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয় না, যে বিন্দুতে ধাতুপৃষ্ঠকে আঘাত করে, সেই বিন্দু হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণ আলো যখন এক স্বচ্ছ পদার্থ হইতে অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করে, তখন রশ্মি তির্যক্‌বর্তিত হইয়া যায়। কিন্তু রঞ্জন-আলোর রশ্মি কোন বিশিষ্ট দিকে তির্যক্‌বর্তিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণ আলোককে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইলে অপর পার্শ্বের পর্দায় ঠিক জ্যামিতিক ছায়া পড়ে না, ছায়ার আশেপাশে খানিক দূর পর্যন্ত আলোক থাকে, ইহাকে ইংরাজীতে Diffraction বা সমাবর্তন বলে। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র ব্যবহার করিয়াও রঞ্জন-আলোর সমাবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না।

সুতরাং দেখা গেল যে রঞ্জন-আলোর ধর্ম সাধারণ আলোর ধর্ম হইতে অনেক বিভিন্ন,—সাধারণ আলোর মত রঞ্জন আলোর প্রতিফলন, তির্যকবর্তন বা সমাবর্তন প্রত্যক্ষ করা, বা প্রমাণ করা যায় না। এইজন্য একদল বৈজ্ঞানিকের মত ছিল যে রঞ্জন-আলো বাস্তবিক আকাশের স্পন্দনজাত তরঙ্গ নয়, অতি ক্ষুদ্র ধাবমান তাড়িত নিরপেক্ষ (electrically neutral) কণা-সমূহের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই অনুমানের অনুকূলে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জার্মেনীর প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্লাঙ্ক (Planck), ভীন (Wien) এবং স্টার্ক (Stark) ১৯০৭-৮ খৃস্টাব্দে অন্যবিধ প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন করেন

যে, যদি রঞ্জন-আলো বাস্তবিকই সাধারণ আলো বা আকাশ তরঙ্গের প্রকার ভেদ মাত্র হয়, তাহা হইলে উহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য $১০^{-৮}$ c. m. অর্থাৎ সাধারণ দৃশ্যমান আলোর সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র হইবে। এই উপপত্তির দ্বারা রঞ্জন-আলোর প্রতিফলন, সম্বমবর্তন বা তির্যক্‌বর্তন না থাকার কারণ বেশ বুঝা যায়, আলো যে সমতল হইতে প্রতিফলিত হইবে, সেই সমতলস্থ কণাগুলির



বাক্সের ভিতরকার ছবি

পারস্পরিক দূরত্ব অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে আলো ঠিকমত প্রতিফলিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাকে ইংরাজীতে Diffuse Reflexion বলে। এজন্যই মসৃণ কাচপৃষ্ঠ হইতে আলোক রীতিমত প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু অমসৃণ কাচপৃষ্ঠে কণাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া আলো ভালরূপে প্রতিফলিত হয় না, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ঠিক এই কারণে রঞ্জন-আলোর সমাবর্তন পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। আলোকের সমাবর্তন (Diffraction) ব্যাপারটা একটু ভাল করিয়া বোঝা দরকার। পূর্বে বলা হইয়াছে যে আলোক আকাশের স্পন্দনজাত তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। কোনও স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তরঙ্গ ফিরিয়া না যাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাধাকে অতিক্রম করিয়া যায়। জলের তরঙ্গে অনেকেই এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। শব্দতরঙ্গেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—শব্দ বায়ুর তরঙ্গ মাত্র। মনে কর, কোনও প্রাচীরের দুই পার্শ্বে দুইজন লোক আছে, এক

পার্শ্বস্থ লোকটি কোনও কথা বলিলে অপর পার্শ্বের লোক তাহা শুনিতে পায়, বায়ু তরঙ্গ প্রাচীর ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে যাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণ-পটাহে আঘাত করে। তবে প্রাচীরটি যদি খুব উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে শব্দতরঙ্গ আর ততটা ঘুরিতে পারে না, এবং অপর পার্শ্বের লোকে কিছুই শুনিতে পারে না। আলোক-তরঙ্গ সম্বন্ধেও একই কথা, তবে আলোক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি বলিয়া অতি ক্ষুদ্র বাধাতেই সম্পূর্ণ প্রতিহত হয়, বাধা ঘুরিয়া যাইতে পারে না। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, আলো সরল-রৈখিক পথে ধাবিত হইতেছে। তবে বাধা যদি খুব তীক্ষ্ন ও সোজা হয় (যেমন ছুরির ফলা), তাহা হইলে দেখা যায় যে, অপর পার্শ্বের পরদায় ঠিক বাধাটির ছায়া না পড়িয়া, ছায়ার মধ্যে ও কিয়দ্দূর পর্যন্ত খানিক আলো, খানিক আঁধার থাকে, এবং আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ আঁধার হইয়া যায়। ইহাকেই আলোকের সমাবর্তন বলে।

গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, যদি আলোকের সমযাত্রাবিশিষ্ট (of the same dimension) কতকগুলি স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রেখা পরস্পর সজ্জিত করা হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া গমন করিবার সময় বিভিন্ন প্রকারের আলো বিভিন্ন পরিমাণে সমাবর্তিত হয়। কোনও কাঠের ফ্রেমে অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি তার পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত করিলে, এই যন্ত্রের গঠন উপলব্ধি করা যায়। এইরূপ যন্ত্রের অপর পার্শ্বে মুকুর (Converging lens) রাখিলে বিভিন্ন প্রকারের আলো বিভিন্ন বিন্দুতে সংহত হয়।

সুতরাং এই উপায়ে আলোককে বিশ্লিষ্ট করা যায়। জার্মেনীতে Fraunhofer প্রথমে এই উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু আমেরিকা দেশীয় রোলান্ড প্রথমে ইহাকে কার্যকরী করেন। তিনি কাচের উপর হীরকের সূক্ষ্ম ধার দিয়া প্রতি ইঞ্চি পর পর প্রায় চৌদ্দ হাজার সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করেন। ইহাকে ইংরাজীতে Diffraction Grating বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাবর্তন দ্বারা আলোক বিশ্লেষণ করিতে হইলে আলোকের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ অংশ পর পর সজ্জিত করা দরকার।

রঞ্জন-আলোর দৈর্ঘ্য যদি সাধারণ আলোর দৈর্ঘ্যের সহস্র ভাগের এক ভাগ হয়, তাহা হইলে রঞ্জন-আলোর সমাবর্তন প্রত্যক্ষ করিতে আরও সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথ বা সূক্ষ্ম (Diffraction Grating) প্রস্তুত করা দরকার। কাচের উপর এক ইঞ্চিতে কোটি লাইন অঙ্কিত করিতে না পারিলে রঞ্জন আলোর সমাবর্তন লক্ষিত

হইবে না। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্মযন্ত্র তৈয়ার করা মানুষের সাধ্যাতীত। তবে যদি স্বভাবতঃই এমন জিনিস পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাপারটা মানুষের সাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯১২ খৃস্টাব্দে জার্মেনীর মিউনিক (Munich) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাউএ (Laue) গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, স্ফটিক এরূপ Diffraction Grating-এর কাজ করিতে পারে। নানা প্রমাণ প্রয়োগে পদার্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বস্তুর পরমাণুর ব্যাস $১০^{-৭}$ c.m, হইতে $১০^{-৮}$ c.m. পর্যন্ত, অর্থাৎ বস্তুর পরমাণুর ব্যাস ও রঞ্জন-আলোর দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাত্রায়। কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ঐ একই মাত্রার। কিন্তু সাধারণ জিনিসে অণুগুলি এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা Diffraction Grating-এর কাজ হইতে পারে না, অর্থাৎ রঞ্জন-আলোর সমাবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থকে দানা বা (Crystal) স্ফটিকের আকারে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অণুগুলি এক এক বিশেষ শৃঙ্খলামত সন্নিবিষ্ট থাকে।

মনে কর সৈন্ধবলবণের দানা; এগুলিকে ঘনক্ষেত্রাকারবিশিষ্ট দানা আকারে পওয়া যায়। ফেডোরোভ্ (Fedorov), স্কোনোফ্লাইস (Schonoflies), ব্র্যাভেস্ (Bravais) প্রভৃতি স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই স্ফটিক কতকগুলি ঘনক্ষেত্রাকার আণবিক ইষ্টকের সংযোগে গঠিত। মনে কর, কোনও ঘনক্ষেত্রের (Cube) আটকোণে আটটি সাদা বর্তুল আছে, বর্তুলগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। প্রত্যেক বর্তুলকে আমরা একটি sodium পরমাণু মনে করিতে পারি। এই ঘনক্ষেত্রগুলিকে যদি আমরা সমানভাবে পর পর সব দিকে সাজাইয়া যাই, তাহা হইলে একটি ঘনক্ষেত্রাকার আয়তন পাইব। প্রত্যেক ঘনক্ষেত্রের পৃষ্ঠায় মধ্যবিন্দুতে এক একটি কালো বর্তুল স্থাপন করিলে আমরা আর এক শ্রেণী ঘনক্ষেত্র $১০^{৫} \times ১০^{৩}$ পাই। এই কালো বর্তুলগুলিকে আমরা ক্লোরিন (Chlorine) পরমাণু বলিতে পারি। প্রত্যেক স্ফটিকের দুই পরমাণুর মধ্যে যে ফাঁক আছে তাহার পরিমাণ রঞ্জন-আলোর পরিমাণের সমতুল্য। সুতরাং এই স্ফটিকের ভিতর দিয়া রঞ্জন-আলো প্রবেশ করাইলে প্রত্যেক পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া আলোক সর্বদিকে সমাবর্তিত হইতে থাকিবে। আলোর কতকাংশ বরাবর সরল রৈখিক পথে চলিয়া যাইবে। সুতরাং অপর পার্শ্বে আলোক-চিত্রের ফলক রাখিলে যে স্থানে রশ্মিটি ঠিক সোজা পড়িবে, তথায়

একটি সাদা দাগ পড়িবে। প্রত্যেক পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া আলোকের যে অংশ চতুর্দিকে পরিবর্তিত হইবে, তাহার মধ্যে কোন কোন দিকে সমস্ত আলোর তরঙ্গই এক এক কলাতে আলোকচিত্রফলকে পেঁছিবে। কোন দিকে বিভিন্ন ভাবে পেঁছিবে। সুতরাং মধ্যবিন্দুর চারিদিকে ছোট ছোট দাগ পড়িবে। তখন গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা সহজেই আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যাইবে।

লাউয়ে ১৯১২ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম রঞ্জন-আলোর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এর উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার সহযোগী Friedrich এবং Kripping উভয়ে মিলিয়া পরীক্ষা দ্বারা Laue-এর অনুমানের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ লাউয়ে ১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রাকৃতিক দর্শনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অধ্যাপক লাউয়ের আবিষ্কারের পর জার্মেনীতে Friedrich, Debye, Stark এবং ইংলণ্ডের W. H. Bragg, W. L. Bragg, Moseley, Darwin প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ রঞ্জন-আলো সম্বন্ধে অনেক গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত সভ্য দেশেই রঞ্জন-আলো সম্বন্ধে পুরাদমে কাজ চলিতেছে।

এই সমস্ত কর্মীদের মধ্যে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Bragg এবং তাঁহার পুত্র W. L. Bragg-এর কার্য সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার রঞ্জন-আলোর বিশ্লেষণ এবং স্ফটিকের আণবিক গঠন সম্বন্ধে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া ১৮১৫ খৃস্টাব্দের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। Bragg প্রমাণ করেন যে কোনও স্ফটিকের ভিতর দিয়া রঞ্জন-আলো প্রবেশ করাইলে একদিকে যেমন আলোকের পরিবর্তনের জন্য ফোটোগ্রাফে বিশিষ্ট ছায়া পড়ে, অপর দিকে তেমনই আলোর কতকাংশ বিশেষ বিশেষ তল হইতে নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়। পূর্বে স্ফটিকের আধুনিক গঠন সম্বন্ধে স্ফটিকতত্ত্ববিদ্দের মত খানিকটা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনে কর, Zinc Blende স্ফটিক, ইহার সম পরিমাণ দস্তার ও গন্ধকের যোগে গঠিত এবং ঘনক্ষেত্রাকার স্ফটিক আকারে পাওয়া যায়। ঘনক্ষেত্রের যে কোন বাহুর দিক্‌কে আমরা স্ফটিকের অক্ষরেখা বলিতে পারি; এবং অক্ষরেখার সহিত লম্বভাবে অঙ্কিত তলকে প্রধান তল বলিতে পারি।

স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, যখন আঘাতে বা অন্য কোন কারণে স্ফটিক ফাটিয়া যায়, তখন স্ফটিকের দুই অংশ প্রধান তলে বিশ্লিষ্ট হয়—এইজন্য

প্রধান তলকে "অবচ্ছেদের তল" বলা যায়। অভ্র সকলেই দেখিয়াছেন ; অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অভ্র অতি ক্ষুদ্র স্ফটিক সমূহের সমন্বয়ে গঠিত। অভ্রের পাতগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। এই স্তরগুলি স্ফটিকের অবচ্ছেদ তল, অর্থাৎ এই তলে পরমাণু সর্বাপেক্ষা ঘন সন্নিবিষ্ট।

ব্র্যাগের মতে এই সমস্ত বিশিষ্ট তলে পরমাণুগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই তল হইতে রঞ্জন-আলো নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হইবে। পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা নিজেদের অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে ঠিক সমতল পাওয়া গেলে রঞ্জন-আলোও সাধারণ আলোর ন্যায় নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ কুব্জপৃষ্ঠ কাচ হইতে সাধারণ আলো যেমন প্রতিফলিত হইয়া সন্ধিবিন্দুতে সংহত হয়, অভ্রের কুব্জপৃষ্ঠ মুকুর হইতেও রঞ্জন-আলো সেইরূপ প্রতিফলিত হয়।

ব্র্যাগ (Bragg) এই প্রতিফলিত রঞ্জন-আলোর (intensity) প্রখরতা মাপিবার জন্য খুব সূক্ষ্ম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সাধারণ গ্যাস তাড়িত-অপরিচালক, কিন্তু গ্যাসকে রঞ্জন-আলোর দ্বারা আলোকিত করিলে, গ্যাসের অণুগুলি বিয়োগতড়িৎযুক্ত তড়িৎরেণু (electrons) এবং যোগতড়িৎ-যুগ (অণুবীজ) (positive nucleus) আংশিক এই দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তড়িৎ সহজেই গ্যাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে। এই প্রথাকে ইংরাজীতে ionization বলে, বাঙ্গলায় আমরা রেণুবিভাজন বলিতে পারি। রঞ্জন-আলোর প্রখরতা বা তেজ যত অধিক হইবে, রেণুবিভাজনও ততই প্রবল হইবে।

প্রতিফলিত রঞ্জন-আলোককে এইরূপ অল্পচাপে আবদ্ধ বাষ্পচূর্ণ আধারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইলে মধ্যস্থ বাষ্পের 'রেণুবিভাজন' হইতে থাকে ; সুতরাং 'রেণুবিভাজন' মাপিলেই প্রতিফলিত আলোকের তেজ বা প্রখরতা ঠিক পরিমাণ করা যায়। ব্র্যাগের উল্লিখিত 'রঞ্জন আলোর বর্ণছত্র মাপক যন্ত্র' লাউয়ের যন্ত্র অপেক্ষা খুব অল্প সময়ে ভাল ফল দান করে।

সাধারণ আলোক যেমন নানা আয়তনের তরঙ্গের সমষ্টি, রঞ্জন-আলোও তেমনি নানা আয়তনের তরঙ্গের সমষ্টি, ব্র্যাগের 'বর্ণসূত্রের মাপকযন্ত্রে' তরঙ্গগুলি বিভিন্ন পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

লাউয়ের আলোক-লিপি (Radiogram) এবং ব্র্যাগের 'বর্ণছত্র মাপক যন্ত্রের' সাহায্যে স্ফটিকের আভ্যন্তরিক গঠন নির্ণয় করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা

করা যাইতেছে। এই দুই যন্ত্রেই কাজ করিতে খানিক সময়ের প্রয়োজন হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টেরাডা, আলোকচিত্রের ফলক ব্যবহার না করিয়া প্রস্ফুরক পরদা ব্যবহার করেন। লাউ-এর উদ্ভাবিত উপায়ে আলোর যেখানে দাগ পড়ে, টেরাডার উদ্ভাবিত প্রণালীতে সেই সমস্ত স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে। সুতরাং শুধু চোখে দেখিয়াই স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই উপায় ততটা সূক্ষ্ম নয় বলিয়া স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌গণ এখনও উহার সম্যক ব্যবহার করেন না।

লাউএর যুগপ্রবর্তক আবিষ্কারের পর হইতে রঞ্জন-আলো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতের সর্বত্র কাজ করিবার সাড়া পড়িয়াছে। জার্মেনী এবং ইংল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও কর্মীর অভাব নাই। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই কাজকর্মের ধারা কতকটা বুঝা যাইবে। প্রধানতঃ স্ফটিকের মধ্যে পারমাণবিক সংস্থান, এবং রঞ্জন-আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় লইয়াই বর্তমানে আলোচনা হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে স্ফটিকতত্ত্ব ঠিক Schonfleis, Bravais, Fodorov প্রভৃতি মনীষিগণ স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুমান করিয়াছিলেন সে সমস্ত প্রায়ই ঠিক্।

এখন বোধ হয় তোমরা রঞ্জন-আলো বা **X-ray** সম্বন্ধে অনেক কথাই শিখিতে পারিলে। রঞ্জন ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে দৈবক্রমে এই আলোর আবিষ্কার করিয়া জগতের যে কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনা দ্বারা শেষ করা যায় না। ডাক্তারেরা ইহার সাহায্যে চিকিৎসা করিবার একটি নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছেন। তোমার হাড় ভাঙ্গিয়াছে,—কতটা ভাঙ্গিয়াছে, ডাক্তার রঞ্জন-আলোর সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া ঠিক্‌ভাবে তাহা জোড়া লাগিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলেন। এইভাবে একদিন মানুষের যাহা কলপনারও অগোচর ছিল, তাহাই সম্ভব হইল। প্রস্তর বল, কাঠ বল, মাংস বল, প্রায় অধিকাংশ পদার্থের ভিতর দিয়া এই আলো প্রবেশ করিতে পারে। রঞ্জন-আলো পুরু সীসকের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য যদি মানুষের শরীরের ভিতর গুলি প্রবেশ করে, তাহা হইলে রঞ্জন-আলোর সাহায্যে গৃহীত চিত্রে একটি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের মত দেখাইবে। একজন সৈনিকের মাথার ভিতরে যে গুলি প্রবেশ করিলে, সেই স্থানটিতে একটি কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখাইয়া দেয় কোথায় গুলি

লাগিয়াছে। রঞ্জন আলোর দ্বারা গৃহীত চিত্রের নাম (X-Radiographs) এক্স-রেডিওগ্রাফ।

কেবল যে ডাক্তারেরাই রঞ্জন-আলোর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা নহে। বর্তমান সময়ে ব্যবসায়ীরাও ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে উহার সাহায্যে জিনিসপত্র যাচাই করেন। এই আলো এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থূল ইস্পাতের দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। উহার মধ্যে যদি কোনরূপ রন্ধ্র বা ছিদ্র থাকে তাহা হইলে সহজেই ধরা পড়ে। কঠিন কাষ্ঠখণ্ডের প্রায় ১২ ইঞ্চি পরিমাণ ভিতরে এই আলোক প্রবেশ করিতে পারে, কাজেই কাঠের ভিতরে ফাটল থাকিলে তাহা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। হাওয়াই জাহাজ বা Aeroplane তৈয়ারী করিবার সময় এঞ্জিনিয়ারেরা এইরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্দোষ দ্রব্যাদি দ্বারা যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারেন।

রঞ্জন-আলোর সাহায্যে আমরা এমন অনেক জিনিসের আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে পারি, যাহা পূর্বে কখনও সম্ভবপর ছিল না, যেমন নকল মণি-মুক্তা ও আসল মণি-মুক্তা চিনিয়া লওয়া, বুটজুতা পায়ে পরিয়া থাকিলেও পায়ের হাড়ের ছবি তোলা যায়। খামের ভিতরের চিঠি খাম না খুলিয়াও পড়া যাইতে পারে। যক্ষ্মার ন্যায় কঠিন ব্যাধির চিকিৎসাও এই আলোর সাহায্যে পরীক্ষা করা অনেকটা সহজ হইয়াছে। এক কথায় এই আলোর সাহায্যে অনেক দুরারোগ্য রোগের প্রতিকারের পথ সুগম হইয়াছে। রঞ্জন-আলোর যন্ত্রের ব্যবহার করা অতি কঠিন কাজ এবং উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। এই যন্ত্র পরিচালনার সময় অসতর্কতাবশতঃ অনেকে তাহাদের হাত, বাহু এমন কি প্রাণ পর্যন্ত হারাইয়াছেন ; ইহা পরিচালনায় দক্ষতার প্রয়োজন।

আট

অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[এক]

London
June 27—1936

স্নেহাস্পদেষু

তোমার গত সপ্তাহের চিঠি পাইলাম। কোপেনহাগেন্ হইতে এখানে ফিরে এসেছি। জার্মান পুস্তকগুলো পেয়েছ কিনা লেখ নাই।

তুমি যদি October-র পর থাকিতে না চাও, আমার সঙ্গেই যাইবে। ১৫ই অক্টোবর নাগাদ আমরা রওনা হইব। ইহা ছাড়া আর কিছু করা এখন সম্ভব নয়। কারণ আমি ১লা জুলাই Queen Mary জাহাজে America যাচ্ছি। আমাকে এই ঠিকানায় চিঠি লিখবে।

C/o Prof. Harlow Shapely
Harvard College Observatory,
Cambridge, Mass, U. S. A.

আমি ২৩শে সেপ্টেম্বর বিলাতে ফিরে আস্‌ব। আশা করি তুমি আর দুইমাস জেনিভাতে থাক্‌তে পারবে। তুমি খুব Homesick হ'য়েছ জেনে আমি খুব উদ্বিগ্ন রহিলাম। কিন্তু এখন আর কি করা যায়? আমি আমেরিকা হইতে গল্পের বই, ইত্যাদি খুবই পাঠাব। খুব পড়াশুনা কর এবং workshop-র কাজ, camera-তে ফটো তোলা, Gardening ইত্যাদি শেখ। তোমার ছবিগুলো মা'কে পাঠাইলাম। মুরলী ও বুড়ীরও দুখানা চিঠি পাঠালাম। তাহাদিগকে চিঠি লিখবে। আমি ভাল আছি, তোমার কুশলসংবাদ দিবে।

ইতি—

আশীর্বাদক
তোমার পিতা

[দুই]

Write letter up to Sept. 1 to
C/o Prof. H. Shapely,
Harvard College Observatory
Cambridge, Mass, U. S. A.
30.6.36

স্নেহাস্পদেষু,—

খোকা, আজ আমি আমেরিকা যাচ্ছি। কাল টেলিফোনে যেমন কথাবার্ত্তা হ'য়েছে, আশা করি সেইমত কাজ করিবে। কোনরূপ গোলমাল করিবে না। আমি আমেরিকা হইতে রীতিমত চিঠি লিখ্‌বে। জার্মান পড়া আরম্ভ করেছ কিনা জানাবে। মা'র মুরলী ও বুড়ীর কাছে চিঠি লিখবে। আশা করি ভাল আছ।

আশীর্বাদক
তোমার পিতা

[তিন]

Harvard College Observatory
Cambridge Massachusetts
July 25, 1936

স্নেহের খোকা,

তোমার ১৫ই জুলাই এর চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। আশা করি আমার Queen Marry হইতে লিখিত কার্ড ও চিঠি ও অন্যান্য চিঠি পাইতেছ। তুমি যে জায়গায় গিয়াছ তাহা বেশ ভাল জেনে সুখী হইলাম। আগামী সপ্তাহে তোমার জন্য আমার ছবি পাঠাব।

এই সপ্তাহে দুখানা বই পাঠালাম। দুখানাই Populer Scientific। Microbe-hunter বইখানি চমত্কার লেখা। আগাগোড়া পড়িবে। আশা করি বুঝিতে কোন কষ্ট হবে না। তোমার German পড়া কেমন হচ্ছে লিখিবে। সে সম্বন্ধে কিছু লেখ নাই।

তোমার চিঠি হইতে মনে হয় তুমি অত্যন্ত homesick হ'য়ে পড়েছ। ইহা খুবই স্বাভাবিক। তবে ছেলেদের সাথে খুব মেলামেশা করিবে। এবং খেলাধূলা করিবে। শুধু বই নিয়ে বসে থাকবে না। শুধু পড়াশুনাটাই জীবনকে সার্থক করতে পারে না, লোকের সাথে মেলামেশা করাটাও অত্যন্ত দরকার। যদি একেবারেই ঐ জায়গা ভাল না লাগে, তাহা হইলে ডাঃ দাসের বাড়ী আসিয়া থাকিও। বাড়ীর চিঠি পেয়েছি। সকলেই ভাল আছে। ইতি

আশীর্বাদক
তোমার পিতা